প্রকাশক ঃ

রণজিৎ দেব

উচ্চারণ

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

আষাঢ় ১৩৬৩

মুদ্রক ঃ

তাপস সাহা

তরুণ প্রিন্টার্স

২৯ কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ভূ মি কা

কয়েক দশকের সময় সীমায় প্রকাশিত কবিতাবলীর স্বল্প সংখ্যক কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রকাশকালের উল্লেখ থাকলেও কবিতাগুলি সেভাবে না সাজিয়ে বৈচিত্র্যের জন্যে একটু ভিন্নভাবে সাজানো হয়েছে। কয়েকটি কবিতার ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকায় রচনাকালের উল্লেখ করা গেল না। বানান সম্পর্কেও কোথাও কোথাও ভিন্নতা থেকে গেল। এই বইটির গরিষ্ঠ অংশের কবিতা নির্বাচনে সাহায্য করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। এজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই দীর্ঘকাল নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্বেষণের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। নানা পর্বে উদ্বেল সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটি ক্রমিক বিবর্তনও হয়তো স্পষ্টতা পেয়েছে। কবিতার জগতে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়, সব প্রশ্নের সদুত্তরও সকলের জানা নেই। কবি কবিতা লেখেন, পাঠক অনুগমন করেন। পাঠকের ভালো লাগার দিকে যদি পাল্লা ভারী হয় তাহলেই একজন কবির উদ্যোগ ও শ্রম সার্থক।

রথযাত্রা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
৩।১ গাঙ্গুলী বাগান
কলকাতা-৭০০০৪৭

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন।

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
পড়ে' যাবে মনে রাখো নাকি?
মুছে গেলে জীয়ন্ত জীবিকা
কী করিবে তখন একাকী?
শুধু চোখে ক্লান্ত গতভাষ।

হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী।
খোল রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান-শঙ্কা-ছাড়ো!
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন!

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নীচে কাঁপে মদালসা বায়ু,
হে ললিতা, কাছে এসো শোনো—
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু!

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ।

তাণ্ডবের দীর্ঘশ্বাস শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাঙ্ক্ষার জাল বুনে বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
বক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন।

এই লহো মোর দুই হাত।
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি!
ক্লান্ততনু সুন্দর অক্ষয়।

স্বপ্ন-কামনা

সুলোচনা হে ললিতা শোনো,
একথা কি ভেবেছো কখনো
ধূলিরুক্ষ বাতায়ন-তলে
আমাদের উদ্দাম প্রণয়
স্থগিত রাখিবো কোন্ ছলে?

তারাভরা আকাশের তলে
স্বর্ণপাত্র হ'তে হে সুন্দরী
ঢালো সুধা মরুপাত্রে মোর,
বাহুডোরে বিদ্যুৎ আশ্লেষে
কৃষ্ণমৃত্যু ছায়া ঘনঘোর!

আমাদের দিন আর রাত
ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়,
রক্ত-সন্ধ্যা সোনালী প্রভাত
স্থবিরের হৃদয় জড়ায়।
স্তব্ধ হোক দুরন্ত ক্রন্দন।

নক্ষত্রেরা রাতের আকাশে
আজো ওঠে, আজো তারা হাসে,
নভোনীলে চাঁদ একফালি
নীল-লাল ফুলের দেয়ালি,
এইসব কে-না ভালোবাসে!

সুপ্রসন্ন দাক্ষিণ্যের ভারে
মগ্ন হয়ে কান পেতে শুনি,
নিরপত্য বুকের ভাণ্ডারে
ধমনীর দ্রুততম ধ্বনি,
বক্ষে প্রেম উদ্ধত নিশ্চয়!

নীপশাখে পুষ্পিত কুসুম
দক্ষিণের স্রোতে ভেসে-ভেসে
হিমগন্ধে চোখে আনে ঘুম,
তোমাকে কি লভেছি কুমারী
যুগ-যুগ ধ্যানে অবশেষে?

ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে
যদি কভু হই একজন,
মালা হাতে মুক্ত স্বয়ম্বরে
স্মিত হেসে আরক্ত অধরে
চিনিতে কি পারিবে তখন?

রক্ত রাত্রি হবে যবে ভোর
বিচ্ছেদের ঝাপটের মুখে

আমাকে কি জড়ায়ে তখনো
কাছাকাছি আরো কাছে বুকে
রবে দু'টি নগ্ন বাহুডোর ?

দূরতর শূন্যে দৃষ্টি রাখি'
যদি কভু ভ্রান্ত হ'য়ে থাকি,
চিত্ত মোর মহত্ত্বের পানে
অকপটে টেনে লহো তুলে
উদাত্ত উদ্‌ভ্রান্ত আত্মদানে !

যাত্রা

তবু নীল চোখে
সমুদ্রের গভীর বিস্ময় ;
ভয় হয়,
পল্লবপ্রচ্ছন্ন এই চোখের আলোকে
অজ্ঞাত প্রণয় ।

যাত্রা শেষ, কবে যাত্রা শেষ
পিছনে পৃথিবী এক বিলুপ্ত, ধূসর ;
ক্লান্তগতি, তৃষিত অধর,
এ যাত্রার কবে হবে শেষ ?

দুই হাতে ঠেলে তমিস্রারে
দুর্দম জোয়ারে
আজো চলি কোনোমতে ভেসে ;
রেডিয়োতে সিনেমায় ট্রেনের চাকায়
জীবনের ঝড় ;
স্তিমিত পশুর মতো এখন সহর ।

রাঙা সন্ধ্যা আসে শনিবারে,
আবদ্ধ পথের ধারে
ভিক্ষার আশায় থাকে ইহুদি মেয়েটি,
যেদিকে ফেরাই কান
অযুত যোজন-ব্যাপী রেডিয়োর গান ;
অবশেষে ভিড়ি গিয়ে সিনেমা ও চায়ের দোকানে।

কী নিবিড় চোখ !
স্মৃতির বিষাক্ত ভারে থরোথরো কাঁপে
এই মরলোক ;
আজকের বসন্তের অন্ধকার রাতে
হৃদয়ে জড়তা ;
যে-মন গুঞ্জন শুনে অভিভূত ছিল
মৃত্যু-ভয়ে স্তব্ধ হ'লো তা।

কৃষ্ণচূড়া শাখার পিছনে
আজো হাসে ক্ষীণকটি তৃতীয়ার চাঁদ
যুবতীর মতো ;
আর নীচে অন্ধকারে গভীর ছায়ায়
স্টেশনের ম্লান আলো কাঁপে,
শীতল বাতাস এসে চলে যায় দিগন্তের দিকে
অজ্ঞাত বিলাপে।

রক্তিম, সুন্দর মুখ ফুলের মতন,
কুন্দ বাহু, স্ফীত শুভ্র বুক—
কটি ঘিরে প্রসন্ন যৌবন।
তবু বলি, সব স্তব্ধ হোক,
স্খলিত প্রণয় আজ ঠেকিছে মামুলি,
অদূর গন্তব্য পানে, শূন্য নিরুদ্দেশে
স্রোতে ভেসে চলি ;
শূন্যগর্ভ প্রত্যেক নিমেষ,
কবে শেষ, এ যাত্রার কবে হবে শেষ ?

গলিত নখ

প্রখর রৌদ্রে উথলে ক্লান্তি, আকাশ ফাঁকা।
মরুচারী মন খুঁজে-ফিরে কোনো শান্তি কি ?
বাতাসে অগ্নি, বন্ধ্য করুণ অশথ-শাখা,
যাযাবর দলে নাম লেখাতেও নেই বাকী।

ট্রামের শব্দে দিবানিদ্রা তো হলো উধাও
বৃথাই এখন সাগরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি।
এতোকাল ধরে' আশাবাদে বলো কী খুঁজে পাও
শূন্য ট্যাঁকেতে হয় যদি শেষ সিকিটা মেকি ?

বাণিজ্যে মেলে লক্ষ্মী একথা সকলে মানি।
তাই কি চাকায় তেল জুগিয়েই শ্রমিক মরে ?
ভ্রষ্টলগ্ন দিন বুঝে নাও হে সন্ধানী !
হারায় কোথায়, কোন্ দিকে হাওয়া নিশানা করে।

মনের আকাশে অযুত পাখির নিবিড় মেলা।
রঙচঙে দিন, কল্পনা সুখ মিথ্যা বলো।
রাস্তার মোড়ে মোড়লী করার মজাব খেলা
ফুরালো কি শেষে, বাঁকাপথে তবে সোজাই চলো।

জন-গণ-মন লক্ষ্যই যদি আসল হয়
টাটকা বুলির ব্যবসা করেই লোক মাতাও।
লক্ষ্যভেদের সহজ উপায় শক্ত নয়,
বাক্যের স্রোতে চায়না কিম্বা স্পেইনে যাও।

পিচের গন্ধে পিপাসা মেটাই বিদেশী ফুলের।
চায়ের দোকানে ভিড় না থাকলে বাকীতে কিনি।
বড়ো বড়ো বুলি কপচানো খাসা, জানা আছে ঢের
আড়ালে দেবতা কেন যে হাসেন, কোথায় তিনি।

বৃথাই জীবনে স্বপ্ন দেখেছি সন্ধ্যার পথ।
বসন্ত দূরে, রাঙা সন্ধ্যাও জীবনে নেই।
ঢের চাঁদা দাও, কংগ্রেস করো তবু মনোরথ
বিফলেই যায়, যে-তিমিরে আছো সে-তিমিরেই।

স্বর

অন্ধকারে যেন কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কার স্বর!
পাষাণে অশ্বত্থ-শাখা, হৃদয় পাথর
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
এই ঘরে অনেকেরই দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া
এ স্বর নিথর,
অকস্মাৎ সেই কণ্ঠস্বর!

'কী ভাবচো: ভাবনার শেষ আছে নাকি!'
চুপচাপ: টিক-টিক ঘড়ির আওয়াজ
এ ঘরে গুমোট:
তাস খেলে কাজ নেই আজ।
'ঐন্দ্রিলার কী খবর: সে চিঠির এসেছে উত্তর?'
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা!
'নটুবাবু ইহলোকে নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

ছোট-ছোট কথা: কিছু ফিসফাস চুড়ির আওয়াজ।
'বাহিরে যে অন্ধকার! তোমার টর্চটা কোথায়?'
আকাশে যেদিকে চাও: শুধু দেখা যায়
;কার, আসন্ন মেঘের ঘটা, তাস খেলে কাজ নেই আজ।

কামনা-পীড়িত চোখ, ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি।
আরো কাছে ঘেঁসে বসে মেদনম্র মেয়েটির কাছে,
বলে হেসে ঃ 'যাবে সিনেমায় ?'
সূর্য ঢলে অস্তাচলে অন্ধকার নামে চরাচরে
আজ তো সপ্তাহ শেষ, আজ শনিবার !
স্নায়ুকোষে সারাক্ষণ তীব্র তৃষা আনাগোনা করে,
শিকারীর শ্যেন নেশা নয়নে আবার।

এ ঘরে গুমোট
এ ঘরে অনেক দীর্ঘ দীর্ণ প্রেতচ্ছায়া ঃ
অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
এ জীবনে স্বপ্ন নেই ব্যর্থ এই পৃথিবীর মায়া।
'নটুবাবু ইহলোকে নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

চুপচাপ ঃ টিকটিক ঘড়ির আওয়াজ।
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই ঃ কেউ নেই ঃ মেলে না উত্তর।
'কালকে মিস শান্তি বোস – সে খবর রাখো ?'
বলে' দিই ঃ এ ঘটনা তারি কিন্তু জের :'
ওরা কি জানে না
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা !

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী,
তমালতালীবনরাজিনীলা...
'কী ভাবচো ঃ ভাবনার শেষ আছে নাকি !'
বলিল সে ঃ 'যাবে নাকি ওইখানে এখন বাগানে ?
দ্যাখো চেয়ে তোমার সন্ধানে
রাতের তুহিন হাওয়া দ্বারে এসে করাঘাত হানে !

হয়তো মাধবী রাত হ'য়েছে উতলা,
সার্থক হয়েছে পথে অন্ধ, পথভোলা ;
যেন কা'র প্রতীক্ষায় প্রাঙ্গনের হিম বনতল
ঈষৎ চঞ্চল ;—
যাবে ওইখানে ?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিল না উত্তর,
এ ঘর নিথর ।
ধীরে ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর ।

'তুমি না কুকুর পোষ ঃ কী কুকুর স্পেনিয়েল ?'
'রমা সেন ভাগ্যবতী, এ বছরে আই-সি-এস হ'লো চারু রায় !'
'সে কেসটার কিছু জানো ঃ বর্মনের ক'দিনের জেল ?'
'হারছড়া কতো হ'লো ? দুশো দশ ? দ্যাখো ডলি এদিকে তাকায় ।'

এই ঘরে অনেকেরই প্রেতদীর্ঘ ছায়া,
এ ঘর নিথর ঃ
অন্ধকারে তবু কা'র ভারী কণ্ঠস্বর ।
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই ঃ কেউ নেই ঃ মেলে না উত্তর !
'জানো কাল মহিমের বিয়ে ?'
'তাই বটে । কী ক'রে যে লটারী টিকিটে
সে ও হ'লো বড়োলোক বিধাতাকে স্রেফ ফাঁকি দিয়ে !
মহিম জানে না
তুমি জানো আমি জানি জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা !
'আজকের কাগজে লিখেছে
প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী ত্রিলোচন দাস
মারা গেছে কাল বজবজে ।'
অন্ধকারে এলোমেলো কণ্ঠস্বর কা'র
এ ঘরে গুমোট ঃ
তাস খেলে কাজ নেই আর ।

চুপচাপ ঃ টিকটিক ঘড়ির আওয়াজ।
সেই ভাঙা থলথলে স্বর ঃ
কা'র স্বর!
প্রশ্ন করে অনেকেই ঃ কেউ নেই ঃ মেলে না উত্তর।

'ও শব্দ কিসের?'
'বাতাসের।'
'বাতাসের শব্দ বুঝি এত ভারী হয়!'
'নিশ্চয়।'
'বেঁচে আছো অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো মৃত, ভারী?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর,
এ ঘর নিথর।
ধীরে ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর॥

মুখ

এখনো কেবল আমি সেই মুখ সর্বত্রই খুঁজি,
দুঃখের দুর্গম দিনে যেই মুখ হৃদয় গহনে
এনে দেয় বরাভয়, প্রাণে ঢেউ তোলে সোজাসুজি,
যেমন বসন্ত আনে ক্ষীপ্রবেগ নির্বাপিত বনে।
আকাশে যখন মেঘ, সারাক্ষণ গুরু-গুরু ধ্বনি,
পথে ঘন অন্ধকার, হিমসিক্ত বাতাস কঠিন;
দেখেছি তো সেই মুখ, কেঁপে ওঠে অশান্ত ধমনী,
নাকে টানি হিমবায়ু, দেহে নামে বৃষ্টি-ঝরাদিন!

যখন দুঃসহ দাহে মেঘহীন আকাশ আমার,
বাহিরের অবজ্ঞায় হৃদয়ের চেতনা পাথর;
যতোদূর চোখ যায় দগ্ধপ্রাণ বিষণ্ণ খামার,

আমার দুর্গম পথে শুধুমাত্র সে-মুখ নির্ভর।
এ-মুখ মসৃণ নয়, এ মুখ নয়তো রমণীর,
জনতার শ্রমদৃপ্ত এ মুখের প্রশান্তি গভীর ॥

ব্ল্যাক আউট নেই

সহরে সমস্ত ছায়া উন্মোচিত মুক্ত এত দিনে।
চৌরঙ্গীতে দীপালোক, ঝলকিত আহত নগরী।
অপগত দিনগুলি আজ ফের আনমনে স্মরি।
পুরাতন লুপ্ত আলো অবিলম্বে নিতে হয় চিনে।
দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত দীর্ণ পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা শীতল মাটিতে
কঠিন হাড়ের স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে!

আলোকের উৎসমুখ দিকে দিকে যায় তবু খুলে।
স্থগিত হ'লো কি যাত্রা রক্তস্রাবী সন্ত্রাসে আঁধারে?
বন্ধুরা অনেকে দেখি নিরুদ্দেশ আজ পথ ভুলে।
রজনীর অন্ধকার নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারকারে।
অনেক রাতের শেষে অতর্কিত অজস্র আলোকে
সহসা বিমনা হই, ঝড় ওঠে স্মৃতি-কল্পলোকে।

নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা

[১]

নবরূপে লভিলাম।
সহর সীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।

দূরে নদী ; ঝরায় সন্ধ্যার সূর্য জ্বলে অবিরাম
গোধূলীর সোনালী আবির ;
গরু লয়ে ঘরে ফেরে
ঘর্মাক্ত কৃষাণ, সন্ধ্যার আকাশে
চাঁদ উঠে আসে,
অশ্বত্থ-বটের তলে ঝিঁঝিঁ পোকা ধরে ঐকতান।
এক ফালি মাঠ ; পুরনো লণ্ঠন হাতে
সমুখের পথ দিয়ে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী ;
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনির মুখে হাসি।
পুরনো মন্দির জনহীন। জ্বলে না তো সন্ধ্যাবাতি—
অবলুপ্ত স্তবগান, কুমারী-আরতি।

[২]

কেন ভয়, কেন বিহ্বলতা, কেন এই বেদনা নিগূঢ় ?
মন্থর মুহূর্তগুলি
আপন স্মৃতির ভারে মৌন, তন্দ্রাতুর।
সদম্ভ অঙ্গুলি তুলি'
নির্মম কদমে চলে ক্ষমাহীন কাল,
উন্মত্ত ভয়াল
ক্ষিপ্র তার গতিবেগে কর্মের আভাস।
শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস
আকাশে বাতাসে ঘুরে মরে,
মধ্যাহ্নবেলায় সন্ধ্যায় রাতজাগা রজনীর স্বরে।
রাত্রি আসে, হাওয়া বয় উন্মুক্ত ধারালো—
সমস্ত শরীরে লাগে ভালো ;
নির্জন প্রান্তরে হাঁটি, অরণ্য মর্মরে শুনি কার
ক্লান্ত হাহাকার,
অনেক বাতাসে আজ হৃদয় পাহাড়।

[৩]

নবরূপে তবু লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
হে হৃদয়
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়,
সত্তার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি,
আনো অনুভূতি
আহত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা প্রদোষবায়ুর ;
বিপন্ন স্নায়ুর
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লেদ ; ঘোলাটে আবেগ
শূন্য মনে, অশান্ত শরীরে—
আসুক সেখানে ফিরে
জঞ্জালকে দূরে ঠেলে সদ্যোজাত দৃপ্ত গতিবেগ !
যাত্রাপথ তলে
মাধবী-বল্লরী মূলে যুগে যুগে ঢেলেছে আবীর
দীপ্ত দুঃখদাহে যাত্রীদলে ;
(নিদ্রাহীন বেদনায় আর কেন চঞ্চলতা হে বিজয়ী বীর !)
মনের প্রাঙ্গণে আজ জিজ্ঞাসার লক্ষ সূর্য জ্বলে।
এক ফালি মাঠ , পুরানো লণ্ঠন হাতে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী,
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনির মুখে হাসি।

[৪]

হে হৃদয়
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয় ;
আকাশে বিপন্ন চাঁদ, নির্জন প্রান্তরে
বাদুড়ের কৃষ্ণ ডানা নড়ে—

কত জন্ম কত জন্মান্তরে
ভাঙা হালে পাড়ি দিতে গিয়ে তবু পেয়েছি অভয়।
অস্তাচলে সূর্য ঢলে, নবসূর্য এক
মানুষের বুকে—
দুঃখদৈন্যে রুদ্ধশ্বাস তবু রাত্রিদিন
উদ্যত সে কালের বাহিনী
চলেছে সমুখে।
ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার ফাঁদ থেকে দিলো মুক্তি আজ
রক্তস্রাবী কল্লোল কালের ;
জীর্ণতার অবশেষ, উঠেছে আওয়াজ
নদী প্রবাহের, পূর্ণ নতুন প্রাণের ॥

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষায় আজো আছি ; কবে যেন বলেছিলে আগে
ফের দেখা হবে, তাই যুগসন্ধিক্ষণে
জ্বরতপ্ত মনে
ধ্যানে জ্ঞানে তোমাকেই রাখি পুরোভাগে।
চারিদিকে অবিরাম যুগান্তের ঢেউ
রাত্রিদিন আবেগ-গম্ভীর
কেঁপে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন নীড়
মেরু থেকে অন্য মেরু, সুমেরু শিখরে
ঘরে-ঘরে হাটে ও প্রান্তরে
সর্বত্রই জীবনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার বাণী,
তোমার আশায় তাই আছি বজ্রপাণি।

শেষ কবে হয়েছিল দেখা
মনে পড়ে না তো।
সে কি পলাশী/মাঠে ? পাণিপথে ?

সিপাহী যুদ্ধের দিনে ? বেয়াল্লিশ সালে ?
বর্গী হানা দিয়েছিল কবে ? ক্লাইভের পঙ্গপালে
ভরেছিল আম্রবন, কেঁপেছিল শান্ত ভাগীরথী ;
শুষ্কপত্র পড়ে ঝরে'
বনে বনে অন্ধকার, বায়ু কেঁদে উঠেছিল জোরে।

যে বাঁচায় তারে নিয়ে আছি।
দরিদ্র কুটিরে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকার আরো কাছাকাছি
শুষ্ক মাঠে তৃষ্ণা জেগে রয় ;
ঘুরেছি তো রিক্তহস্ত দীর্ঘদিন দগ্ধ পথে-পথে,
অনেক মরমী ব্যথা সুগভীর ক্ষতে।
তারপর ধীরে ধীরে
আলস্যমন্থর দেহ নড়ে' ওঠে ;
জীবনের একান্ত গভীরে
যতো ক্ষোভ পুঞ্জীভূত, সারা হিন্দুস্থানে
বোম্বাই দিল্লীর পথে দোলা লাগে
যতো ভাঙা নীড়ে।

আসমুদ্র হিমাচল সুপ্তোত্থিত কুম্ভের মতন
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে বিশাল বাহিনী,
এখনো কি হয়নি সময় ?
নির্দেশের অপেক্ষায়
দিন চলে যায় ;
নিত্য নব ঘটনার রক্ত লাগে সময়ের
রথের চাকায়,
প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি ॥

এই চাঁদ (অংশ)

এই সেই চাঁদ।
কপালে দিয়েছে টিপ, প্রথম কৈশোরে

চোখে উদ্দীপনা জ্বেলে
হৃদয়কে করেছে উন্মাদ।
এই সেই গোল চাঁদ রূপালী-হলুদ।
দূর নীলে বাঁশবনে তমালের ফাঁকে
মেঘেদের সিঁড়ি ভেঙে চুপে উঠে এসে
যে চাঁদ দিয়েছে ধরা শিশুদের ডাকে,
গোটা পৃথিবীটা ফের হঠাৎ উঠেছে হেসে
গভীর খুসিতে আপনার,
রাত্রির রজনীগন্ধা স্পর্শে যার হয়েছে উন্মাদ,
এই সেই যুগান্তের চাঁদ।

অশোক তরুর 'পরে দেখা যেতো যারে
ছায়া সরে যেতো বনে-বনে
রূপালী থালার মতো প্রতিবিম্ব পদ্মদীঘি পারে,
আলো-বিচ্ছুরিত বাতায়নে,
এই সেই চাঁদ।
যখন দিনের শেষে এ সংসার লেগেছে বিস্বাদ,
প্রত্যহের ঘূর্ণিপাকে ভারাক্রান্ত মন,
বারান্দায় এসে বসা, দেহে লাগে হাওয়া,
উপলব্ধি হয়েছে তখন
এ পৃথিবী হ'তো যদি চাঁদের মতোন!
নির্মল প্রশান্তি এক চন্দ্রিমার কাছেই যে পাওয়া!

এই সেই চাঁদ
পথ দিয়ে যেতে যেতে উদাস পথিক
অতর্কিত যাকে দেখে হয়েছে উন্মাদ।
ছুটেছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে যে মাথা নীচু,
নিস্তরঙ্গ বনস্থলী, ক্রমেই বেড়েছে স্তব্ধ-রাত
মাথার উপরে জেগে
সারারাত ধরে' এই স্নিগ্ধদীপ্তি চাঁদ।

একচক্ষু

যতোদূর দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে সতৃষ্ণ তাকায়।
পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্ত বাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে মেঘে ঝরেছে আকাশ ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসে ওঠে হেমন্তের সোনালি শিশির ;
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে ডালে অজানিত পাখিদের ভিড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবর ছিল আর এখনও আছে
সৌন্দর্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে::
আকাশে যে সূর্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব বিস্ময় দেখা যায়,
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে দিয়ে
খেলা করে রূপসীর মুখের মতন
অচেতন নিরুত্তাপ হৃদয়কে নিয়ে ;
কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো ;
পৃথিবীতে আয়োজন অব্যাহত থাকে অবিরত।
আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবর ছিল আর এখনও আছে
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব নব রূপে হানা দেয় দগ্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাতে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিণী।
মাঠে-মাঠে ছায়া পড়ে ছায়া সরে' যায়
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আন্দোলিত গাছের পাতায় ;

মনে পড়ে' যায়

দূরের উজ্জ্বল মুখ সুবসনা অরূপ মধুর,
স্তম্ভিত মুহূর্তে মন স্মৃতিভারে স্তব্ধ তন্দ্রাতুর ;
বহু ক্রোশ পথ হ'তে এসে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ধীরে ধীরে মেশে
একটি গভীর ক্ষীণ সুর।

নিভৃত হৃদয় নিয়ে যদি কোনো একদিন শুভ অবসরে
আচ্ছন্ন হৃদয়বাষ্প ফুল হ'য়ে ঝরে,
স্নানরতা রমণীর পদ্মওষ্ঠে স্তনযুগে কটিতটে চোখ গিয়ে পড়ে,
দোলা লাগে হাড়ভাঙা বক্ষের পিঞ্জরে,
মনে রেখো নীলাকাশ বাঁকা চাঁদ নীল ফুল মাঠের শিশির,
পাতার আড়ালে পাখিদের
ছায়াঘেরা ছোট ছোট নীড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবর ছিল আর এখনও আছে,
কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে ;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো,
বাঁচবো কী নিয়ে ?

তবুও হঠাৎ যদি সংসারের আবর্জনা ঠেলে
নীড়মুখী পাখির মতন
দুরন্ত আবেগ বুকে জেলে
একঘেয়ে প্রয়াসের হয় ব্যতিক্রম,
যদি দূরে দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে ফুলেফলে সতৃষ্ণ তাকায়
মনে রেখো পৃথিবীর রোমাঞ্চিত প্রকৃতির মৌন প্রতীকায়

কোনো অন্ত কোনো সীমা কোনো শেষ নেই,—
আচ্ছাদন খুলে ফেলে রমণী নেমেছে সেই জলে
কামনার পদ্মগুলি ফোটে পলে-পলে,
মনে রেখো নীতিবাক্য ঃ অপমৃত্যু ডেকে আনে
একচক্ষু মতো হরিণেই।

দিনযাপন

কী তবে আমার কাজ ঃ কী কর্তব্য বলোনা যখন
প্রত্যহ দৈনিকে পড়ি পৃথিবীর আসন্ন বিলয়
যন্ত্রের বিকৃত দ্বন্দ্বে। রাজনীতিবিদ অনুক্ষণ
মাতায় বিমর্ষদেশ বক্তৃতায় ; ক্লান্ত চোখে ভয়
রমণীর, দয়িতার,—শান্তি পারাবত খুঁজে খুঁজে
যদিও উধাও প্রাণ, অন্যদিকে যুদ্ধবাজদের
উন্মত্ত হুংকার শুধু, স্মিত শিশু মাঠের সবুজে
ছায়া দেখে চোখ বোঁজে। পশ্চিমেও ইউরোপে ঢের
জোট, দল, আন্দোলন ; দ্রুততাল প্রচারের ফলে
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার ছায়া ; পক্ষান্তরে সুদূর প্রাচ্যের
দুর্গম অরণ্যে দ্বীপে রজনীর অন্ধকারে চুপে
কোরিয়ায় তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
ষড়যন্ত্র চলে রোজ ; বর্বরের লালসার যূপে
রক্ত ঢালে নির্বিরোধ অজস্র শহীদ অবিরাম।
রাম নেই, অযোধ্যাও নেই ; আছে রাজনীতিবিদ্
প্রকৃত বিমূঢ়প্রাণ নায়কেরা ; সংবাদ কাগজে
তাদের বিচিত্র কীর্তি রোজ পড়ি—যদিও শহীদ
এদিকে সংখ্যায় বাড়ে, সাধারণ লোকের মগজে
বাষ্পের উত্তাপ শুধু, শস্যহীন ফসলের মাঠে
ধু-ধু জ্বলে খররৌদ্র, ম্লান ছায়া জনশূন্য হাটে।

কী তবে আমার কাজ : আমিও তো নিরীহ মানুষ
শান্তি খুঁজি জীবিকা অর্জনে ; আরো অনেকের মতো
সংসারের ঘূর্ণাবর্তে হন্যে হ'য়ে ওড়াই ফানুস
অপার্থিব কল্পনার ; যদিও রয়েছে সমুদ্যত
সম্মুখেই ব্যর্থতার নিশ্চিত বিকার। আছি ভুলে
বিড়ম্বিত মৃত্যু ভয় ; অবিরাম সংসারের কাছে
নৈপুণ্য প্রার্থনা ক'রে আবর্তের জট খুলে-খুলে
সম্মুখে এগোই ধীরে ধীরে। আমি যদিও নাস্তিক
প্রকাশ্য বিতর্ককালে, তবু যেন মনের গহনে
কোথায় সংশয় বাধে। পরিপূর্ণ নির্মম নির্ভীক
হ'তে যে পারিনি সেই ভাবনাই সন্তাপিত মনে
বাজায় বিষণ্ণ একতারা। কৈশরের বন্ধুজন
অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, বিয়োগান্ত সংসারকে ছেঁকে
অন্ততঃ কিছুটা রসে রঙ্গময় ক'রেছে জীবন।
তোষামোদে আপ্তবাক্যে অভ্যস্তই, দিয়ে জলাঞ্জলি
সুমার্জিত রুচিবোধে সংসারের সাগর-সঙ্গমে

ডুব দিয়ে তোলে সোনা, দেখায় নিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুলি
আজন্ম সঞ্চিত যতো আদর্শকে ; এমন কি, প্রেমে
যদি পড়ে, সহজেই অবশেষে প্রেমাস্পদা ছেড়ে
পিতৃসত্য পালনার্থে পঞ্চদশীকেই পত্নী মেনে
ভাসায় সোনার তরী ; অন্যদিকে কালের প্রাচীরে
লাল অক্ষরের লেখা ; মাঠে-মাঠে বজ্রাহত লোক
বেকারির ঘূর্ণাবর্তে খাবিখেয়ে বিমর্ষ মিছিলে
বারংবার ভিড় করে, ঝলকিত করে বিশ্বলোক
সর্বস্বান্ত পণ্ডশ্রমে, কৃষ্ণছায়া অবরুদ্ধ নীলে।

কী তবে আমার কাজ : অবিরাম উত্থান পতনে
বিদীর্ণ কল্পান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, গান নয়, লুপ্তপ্রায় স্বস্তির সন্ধানে
পথে মাঠে তেপান্তরে ; পথকষ্টে প্রায় দীর্ণপ্রাণ

তবুও দুর্মর আশা মুহূর্তেই আনে চঞ্চলতা
বিধ্বস্ত প্রাণের পাত্রে,—বারংবার তীব্র আত্মদান
করার সংকল্প নিয়ে ফিরে আসি ; প্রাণের শূন্যতা
ভরে না সংকল্পে শুধু ; অন্ধকারে যেদিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
রিক্ত প্রাণে আনে না আশ্বাস ; সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরে
বারান্দার কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে
কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে
ব'সে-ব'সে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্যাকালে
জন্ম-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ নিয়ে। চন্দ্রালোকে ঘর ভরে
নির্মল নিথর রাতে। কোথায় দু'হাতে স্নিগ্ধ ফুল
ছড়ায় আঘ্রাণ বনতলে ; মত্ত বাতাসের ঢেউ
মুখে চোখে বেগে লাগে, মনে পড়ে এদিনেও কেউ
দূরের মাঠের পথে বাড়ী ফেরে শিস দিতে-দিতে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় মুখ রেখে ; কালো দীর্ঘ এলোচুল
তারই বৌ চেয়ে দ্যাখে দূর মাঠে যেখানে শিমুল
দাঁড়ায় প্রাণের জোরে আকাশের দিকে ডানা মেলে
পরিপূর্ণ প্রতীক্ষায় ; মেঘলোকে নিভৃত পাখায়
বালুহাঁস উড়ে যায় জ্যোৎস্নামত্তা অজ্ঞাতযাত্রায়
অনুমিত অগ্রণীর অদৃশ্য সংকেতে। আর আমি
তন্দ্রাভাঙা শেষরাত্রে গলিপথে হরিধ্বনি শুনে
চমকে স্বরাজ্যে ফিরি, কল্পনার পাখা ছিন্ন ক'রে
শ্মশানযাত্রীর ধ্বনি হেঁকে যায় দূর থেকে দূরে।

কী তবে আমার কাজ : আমি জানি বাঁচেনা মানুষ
স্মৃতিকে সম্বল ক'রে ; কল্পনার অনিত্য ফানুস
উড়িয়েও শেষরক্ষা হয়নি কখনো কোনো কালে।
শুধু গতি, দুরন্ত দুর্বার বেগে একটি পদ্ধতি
সৃষ্টির গোপন মূলে কাজ করে,—যোগসূত্রহীন
আমরা তলিয়ে যাই সমুত্থিত ঢেউয়ের আড়ালে
বল্গাছাড়া ঝোড়ো দিনে ; ব্যর্থকাম, থাকি রুদ্ধরতি,

জোয়ারের তীব্র টানে অনিবার্য হয় অধোগতি।
আজো তাই ক্রুদ্ধ বল্গাছাড়া দিনে দিগন্তে তাকিয়ে
নিশ্চিত আশ্বাস খুঁজে বারংবার রুদ্ধশ্বাস শ্রমে
স্তিমিত শরীর কাঁপে ; ইউরোপে এশিয়ায় হানে
ক্রান্তি তার ক্রুদ্ধ বর্শা, কল্পান্তের নক্ষত্রসন্ধানে
দিগন্ত খণ্ডিত করে ; আর আমি আবদ্ধ নগরে
আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে
বেদনাবিহ্বল ক্ষণে ; বহুদূরে শোনা যায় যেন
গর্জনে উচ্ছ্বাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন
অন্বিষ্ট প্লাবনবেগ ; কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সম্মুখে এগোয় পথে রাত্রিশেষে মরীয়া আবেগে
দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে ; সে-গতির উত্তাপ মননে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগসন্ধিক্ষণে।

কেন এই আলোড়ন

কেন এই আলোড়ন, এই তীব্র গোপন যন্ত্রণা
সমগ্র সত্তাকে ঘিরে, কেন দ্রুত অন্ধ পরিক্রমা
অগ্নিময় আবেগের ; অথচ তুমি তো সুমধ্যমা
এমন কি ইশারায় জোগাওনি উদ্‌ভ্রান্ত মন্ত্রণা
কদাপি নির্জন লগ্নে ; নিতান্তই নিজ আকর্ষণে
বসন্তে শরতে আমি মুখোমুখী তোমার সমীপে
গোপন নিশীথকালে ঃ প্রতীক্ষাবিহ্বল গুপ্তদীপে
জ্বালাতে চেয়েছি স্নিগ্ধ অনিকাম শিখা মনে-মনে।

উদার তোমার প্রাণ, লীলায়িত নম্র ভদ্রতায়
আমাকে নিয়েছো টেনে করুণার শ্বেতসিন্ধু পারে,
তোমার রঞ্জিত রাজ্যে লগ্ন কাটে কথায়-কথায়,
ফিরে আসি স্তব্ধমুখে ভদ্রতার বোঝা টেনে ঘাড়ে।

আমার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাকে কি কখনো ছোঁবনা,
দুর্বিসহ দায়ভাগ কোনকালে তুমি বইবে না ?

আদি চেতনা

দু'দণ্ড থাকবো আমি এইখানে মৃত্তিকায় শুয়ে।
এই যে প্রাচীন বট দৃঢ়মূল এখানে দাঁড়িয়ে
পিতাপিতামহদের প্রতিবেশী। সমাহিত পূর্বসূরীদের
সমৃদ্ধ স্মৃতির সাক্ষ্য ; রুদ্ধবাক আমি সে-বটের
শাখায় শাখায় দেখি আদিরূপ ; বিগতকালের
প্রশ্নাতীত প্রশান্তির রেখা। শান্ত, স্থির অন্ধকারে
অদৃশ্য অতীত তার রোমময় বুকে খেলা করে
প্রগাঢ় বিন্যাসে। আর, অস্তোন্মুখ সূর্য রেখে যায়
গলিত সোনার রঙ কাণ্ডমূলে, পাতায় বাকলে ;
বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্ম বর্ষা অকৃত্রিম দৃশ্যরচনায়
একটি বিন্যস্ত ঐক্য নিত্যকাল রেখেছে বজায়
এই প্রৌঢ় বীতশোক সদানন্দ বৃক্ষের শরীরে।

দু'দণ্ড থাকবো আজ সন্তর্পণে এইখানে শুয়ে
সুপ্রাচীন বৃক্ষমূলে। প্রত্যয়ের আদিম সংসারে
সমর্পিত হবে দগ্ধ আকাঙ্ক্ষারা। একান্ত নির্ভয়ে
অতীতে প্রেরিত যতো প্রতিবিম্ব। এবং যেহেতু
বৃক্ষই আদিম পিতা, আদিপ্রাণ মৌনতার সেতু,
প্রোথিত অতীত থেকে মৃত্তিকায় দৃঢ়বদ্ধতায়
সম্মানিত, অধিষ্ঠিত,—আজ আমি বিক্ষত শরীরে
অস্থির উদ্বায়ু জ্বালা অন্তর্মুখী আঁধারে ডুবিয়ে
প্রজ্ঞা মেধা মননের এই স্থির ঋষির আশ্রয়ে
উদ্‌ঘাটন করবোই আবর্তিত হৃদয়ের দ্বার ;
তৃষ্ণাদীর্ণ বাসনারা অতঃপর ঘুমাবে নির্ভয়ে,
অন্ধকারে, অন্তরঙ্গ সন্নিধানে, নিহিত উদ্ধার॥

স্বদেশ

এই ভালো, এই ঘর ; অমল প্রলেপে পরিপাটি
নিকোনো উঠোনটুকু, শাদা ফুল, শান্ত তরুবীথি
আনন্দে নোয়ায় মাথা, কচিবৃন্তে জীবনের গীতি
আনে হাওয়া, আনে রৌদ্র ; অদূরেই সোনামাঠে খাঁটি
প্রাণ জাগে থরে থরে ; সার, বীজ, জলের সঞ্চারে
সৃষ্টির রহস্য জাগে, নীলাকাশ থেকে নেমে আসে
স্নিগ্ধ, শান্ত নবধারা ; কৃষকের লাঙলের ভারে
মাটির গহনে বেগ, অদূরে পুকুরে জলে ভাসে
সঞ্চিত শেহলা শ্যাম, স্নিগ্ধ শান্ত হিমেল হাওয়ায়
সন্ধ্যায় শরীর কাঁপে, দীপ জ্বলে, ধেনু ফেরে ঘরে
চেনাপথে দলে দলে চাঁদ ওঠে, রহস্যছায়ায়
কাঁপে মাধবীর শাখা, সারা মাঠ মেঠোগন্ধে ভরে।

এই ভালো, এই দেশ ; মা'য়ের শিশুর স্মিত হাসি,
প্রৌঢ়ের বিগত স্মৃতি, যুবকের নিভৃত উদ্যম
মাটি ও মাঠের কাজে,—পণ্য কুটিরের অধিবাসী
সুখে দুঃখে দ্বন্দ্বে গড়া ; এখানে প্রশান্তি নিরুপম
সামান্য সংসার ঘিরে,—অগ্নিহোত্রী মানুষেরা খাঁটি
স্বদেশকে খুঁজে খুঁজে এইখানে পেয়েছিল মাটি ॥

উত্তরার জন্য

উত্তরা, সমস্ত বাড়ি একেবারে খালি
ঘরগুলো অন্ধকার, বারান্দা নির্জন,
এবং বাগানে ফুল ফোটে সারাক্ষণ ;
নির্জনে এবার শুরু হোক গৃহস্থালি।

এই লগ্ন বড়ো তীব্র বড়ো মোহময়
শরীরিণী জ্যোৎস্না কাঁপে বারান্দায় ঘরে ;

বাসনামন্থিত মূর্তি রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে
কী কথা বলতে গিয়ে জড়ো করে ভয়।

উত্তরা, সমস্ত বাড়ি একেবারে খালি।
রাতের নক্ষত্র চুপ, একেশিয়া গাছে
কী যেন ক্লান্তির ঢেউ স্তব্ধ হয়ে আছে—
শুধুই তৃষ্ণায় জ্বলে যায় কণ্ঠনালী ॥

বিচ্ছিন্ন গোপন

চাঁদ যদি ওঠে, যাব সান্নিধ্যে তোমার।
চতুর্দিকে অস্পষ্ট কুয়াশা। থমথমে
সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত মেঘের পাহাড়।
সন্ধ্যা হয়ে গেল যে কখন,
কখন দিনের পাখি ফিরে গেল ঘরে,
এবং নারকেল গাছে শেষ চুম্বনের
স্মৃতিচিহ্ন রেখে স্বর্ণ-সূর্যাস্তের রেখা
মুহূর্তে বিলীন,
জানতে পারিনি আর। কেবল স্মৃতির

সোনার কপাটে জ্বলে রক্ত-আকাঙ্ক্ষার
ক'টি তীক্ষ্ণ রেখা। কে যেন কেবল
রক্ত-পলাশের নেশা ধরায় দু'চোখে ;
মৃতের সমাধিপাশে ফুলের সভায়
দু'হাতে ঢাকতে চায় গোপন ব্যর্থতা।

সন্ধ্যা হয়ে গেল যে কখন
কার্জন পার্কের অন্ধকারে।
আকাশ এখন কোনো অস্থির যন্ত্রণা

বুকে ক'রে গুম হয়ে আছে।
বৃষ্টি হ'লে কিছুটা অসুখ
তিরোহিত হ'তো। বিষরক্ত বেরুলে যেমন
কিছুটা আরামবোধ অসুস্থ শরীরে।
চাঁদ যদি উঠতো এখন
আবর্তিত অন্ধকার পার হয়ে মাঠের ওপারে,
চম্পকের মতো তার আঙ্গুল বুলিয়ে
রুগ্ন আকাশের বুকে গাঢ় হ'তো···
কিন্তু ব্যাপ্ত চতুর্দিকে
থমথমে অস্পষ্ট কুয়াশা ;
রাত্রি গভীরতর হয়েছে কখন,
কার্জন পার্কের সেই যুগল মূর্তিরা
ফিরে গেছে শেষ ট্রাম ধরে'।
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে
ভোর হবে, আবার বেরুতে হবে
সেই অতি পুরাতন
রাস্তা ধরে'
বৃষ্টি নেই জ্যোৎস্না নেই,
কেবল গভীর অন্ধকার···

চাঁদ যদি ওঠে যাবো সান্নিধ্যে তোমার
একদিন, ততদিন রক্ত-আকাঙ্ক্ষার
তীব্র বেদনাগুলিকে
আড়ালে ঢাকতে চায় ব্যর্থ উদ্যোগের
বিচ্ছিন্ন গোপন দুষ্টক্ষত ॥

যে-ভূমিকায় প্রতিদিন

ইচ্ছা হয় চীৎকার করে বলি 'সাট অপ ষ্টুপিড'!
ইচ্ছা হয় ঘাড় ধরে ল্যাম্পপোষ্টের কাছে নিয়ে যাই,

দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধি। তারপর
চাবুক এনে কষে মারতে থাকি যতোক্ষণ না
জ্ঞান হারায়। কিংবা ধাক্কা দিয়েই
মাটিতে ফেলে দিয়ে
জুতো দিয়ে মুখ থেতলে দিই
যতোক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
তারপর সবাইকে এনে দেখাই
নরকের কীটদের শাস্তি
কী রকম শক্ত হ'তে পারে।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে
না-দেখি না-দেখি ক'রে
পালিয়ে এলাম। যা ঘটছে ঘটুক না,
আমার নাক গলাবার
কী দরকার। বাড়িতে ফিরে এসে
বারান্দায় অন্ধকারে
পায়চারি করতে থাকি ॥

কেমন আছেন

কেমন আছেন। ভালো তো সব খবর।
ভালো। আপনাদের কুশল তো?

কেটে যাচ্ছে এক রকম। বলতে বলতে
পাশাপাশি চলতে চলতে
দাঁড়ালেন। সেই কতোকাল আগে দেখা,
আপনাকে দেখেই অনেক পুরনো কথা
মনে হ'চ্ছে। চোখের সামনে নানা দৃশ্য।

এইবার বাস আসবে। উনি যাবেন

ডায়মণ্ডহারবারের দিকে, বিপরীত মুখে
আমি ডালহৌসি। আপনি তো আর
গেলেন না। সেই কবে যাবেন বলেছিলেন

দশ-বারো বছর আগে বলেছিলাম হয়তো।
স্পষ্ট নয় ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি, কোথায় কখন
বলেছিলাম মনে নেই। আমি কিন্তু সেই একই
জায়গায় আছি। কোম্পানীর কাজ, খাটুনী বেশ,
কিন্তু মাইনে মন্দ না, ওভার টাইম আছে।

একটা বাস তিন সেকেণ্ডের জন্যে থেমেই
বেগে ছুটে গেল রুদ্ধশ্বাসে। ভিড়ের মধ্যে
ঠেলাঠেলি, ওঠা গেল না। কলকাতায়
এজন্যেই আসতে চাই না, যা ভিড়। আপনার

দেরী হ'য়ে যাচ্ছে না তো?
একদিন দেরী হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি।
কতোদিন বাদে দেখা!

না কিছু না। সময় হাতে আছে এখনো
পনেরো মিনিট। পথে ওষুধ কেনবার ছিল,
পনেরো মিনিট আগেই বাড়ি থেকে
তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়েছিলাম,
মনে পড়লো। মনে পড়লো আজ ঠিক সময়ে
আপিসে যেতে হবে, জরুরী চিঠির স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার
হাজির থাকবে যথাসময়।

আপনি আসুন না একদিন আমাদের দিকে।
বেশ খোলামেলা, সমুদ্র খুব দূরে নয়,
একটু এগিয়ে গেলেই বঙ্গোপসাগর,
কলকাতার ধোঁয়াকাদা যন্ত্রের ঘর্ঘরের হাত থেকে
অন্তত ক'দিনের জন্যে বাঁচবেন।

এইবার বাস আসতেই উঠে পড়লেন,
শেষবারের মতো : যাবেন কিন্তু,
একটা পোস্টকার্ড, দু'লাইন,
আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রাখবো।
দেখবো, যাব। এবার ট্রাম আসছে উল্টো দিক থেকে,
উঠে পড়লাম, ওষুধ বিকেলের দিকে কিনলেও, চলবে,
হাতঘড়িতে সময় দুলছে পৌঁছাতে পারবো ঠিক সময়।

কেমন আছেন ভালো তো সব।
চমকে উঠেছিলাম কণ্ঠস্বরে।
শুকনো রোগা রুক্ষ কঙ্কালসার মূর্তি,
কথার ভঙ্গিতে কিন্তু চিনতে পারা যায়।
আপনি গেলেন না তো আর। পাঁচ বছর আগে
কথা দিয়েছিলেন, মনে আছে?

বলতে বলতে বাসে উঠে পড়লেন॥

বুকে বুকে বারুদ

একজন প্রশ্ন করলো : দেশলাইতে মোট ক'টা কাঠি থাকে?
একজনের জিজ্ঞাসা : অ্যালসেশিয়ানের বিষদাঁত ক'টি?
উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকি।
আমি সিগারেট খাই না,
কুকুর পুষি না।

অথচ ভীষণ অন্ধকার দেখছি চতুর্দিকে :
কুকুরের মতো কী যেন তাড়া ক'রে আসছে,
আমার হাতে কোনো দেশলাই নেই,
আমি দেশলাইয়ের কাঠি গুনতে থাকি মনে মনে,

অ্যালসেশিয়ানের দাঁতগুলো
জ্বলতে থাকে চোখের সামনে।

একজনের প্রশ্ন ঃ 'সোনালী দিন' কথাটার মানে কি ?
আমরা কি তেমন দিন দেখে যেতে পারবো ?
মাঝে মধ্যে সন্ধ্যার আকাশে সোনা রঙ
যখন সূর্য অস্ত যায় ;
কিন্তু তার পরেই পাষাণের মতো ভারি অন্ধকার।

বুকে বুকে বারুদ ক্রমশই স্তূপ হয়ে উঠছে।
আমি সিগারেট খাই না কিন্তু আগুন জ্বেলে
অন্ধকার তাড়াবো,
আর তখনই হিংস্র কুকুরের বিষদাঁতগুলো
নিজের রক্তে ভাসতে থাকবে···

রাত ভোর হবে ॥

প্রতিবিম্ব

আমি জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম,
মৃত্যুর কাহিনী নয়।
এখন পথে পথে অসফল মৃত্যুকাহিনী
কেমন বিস্বাদ লাগছে।

আমি দেশকে সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে
দাঁড় করাতে চেয়েছিলাম ;
ঝরা বকুলের মধ্য থেকে সজীবতাটুকু
খুঁজতে গিয়েছিলাম একদিন।
এখন সমস্ত দৃশ্যে
মৃত মুখের প্রতিবিম্ব ॥

ঘেরাও

আমি নিজেকেই নিজে ঘেরাও করে রাখছি।
তীব্র ধিক্কার কখনো শাসানি, সাবধানবাণী।
যেন আমি সেই চৌদ্দতলা সওদাগরী আপিসের
জাঁদরেল মালিক পক্ষ, যাকে এখনই
চেপে না ধরলে
ভয় না দেখালে
কিছু আদায় করা যাবে না।

এক একটি দিন পতঙ্গের মতো সবেগে
অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পুড়ে মরছে ;
চতুর্দিকে কালের দীর্ঘশ্বাস,—
নিজেকেই প্রশ্ন করি :
রাজী ? একবার যখন শুরু,
শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে ?

হাওয়ায় ঝনঝন করে উঠছে আর্শির কাচ,
মশারীর খোলস উড়ছে এদিক ওদিক,
আমি নিজেকে ঘেরাও করে রাখি, কোনো ছুতোয়
পালিয়ে যেতে দেবো না।

ছোট রাস্তা বড়ো রাস্তা

আমি বার বার সরু রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তায়
যেতে চাই
বড়ো রাস্তা কখন সরু হয়ে যায়।

বনের পাশ দিয়ে অতিকায় রাস্তা
উজ্জ্বল রৌদ্রে অজগরের মতো শুয়ে,
নাকে তার
জ্যৈষ্ঠের আগুনের হলকা ;

সারা-মাঠের কপালে ছায়া, কালো মেঘের আনাগোনা,
মেঘ উধাও হলে একটানা রৌদ্রের উচ্ছলতা !

আমি সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে
চারদিকে গাছপালা গুল্ম লতাপাতা,
একটু অসতর্ক হলেই পায়ে কাঁটা,
মুখ ছড়ে যায় !
আমি সরু রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তায়
অনেকখানি জায়গা পাবো বলে
লাফিয়ে পড়তে চাই ।

বড়ো রাস্তাও কখন সরু হয়ে যায় ।

রাত গভীর হ'লে

ঠাকুর্দা ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়তেন ।
ভোর হলেই বাবাকে দেখতাম
ফুল গাছগুলোতে জল দিচ্ছেন ।
ঠাকুমা কখন স্নান সেরে ঠাকুর ঘরে,
আর আমার মা উনুন ধরিয়ে দিয়েছেন ততক্ষণে,
একটু বাদেই ছেলেমেয়েরা উঠবে ।

খুব ছেলেবেলার স্মৃতি এই রকমই
একটু পেছন ফিরলেই
জলের 'ওপর পদ্মপাতার মতো স্থির ;
দোলা লাগলেই নিমেষে
জলের অতলে তলিয়ে যায় ।

রাত গভীর হ'লে স্মৃতিগুলো শৈশবকে
ডেকে আনে,

ঠাকুর্দা ঠাকুমা আমার বাবা আর মা
যেন আমার খুব কাছাকাছি,
হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি।

যেন নৌকো ভাসিয়ে চলেছি সবাই
বুড়িগঙ্গায়, দু'ধারে তীরভূমি,
একঝাঁক বক উড়ছে মাথার ওপর,

জলে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি ;
একটি শুশুক জলে ভাসছে তলিয়ে যাচ্ছে,
সূর্যাস্তের শেষ রোদ বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপর,
সন্ধ্যার আগেই গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতে হবে।

রাত গভীর হ'লে শৈশব স্মৃতির ঝাঁপি
খুলে যায়,
ছেলেবেলার পোষা কবেকার সেই পায়রাগুলো
বেরিয়ে এসে পাখা ঝাপটায়।

তোমার ছবি আমার ছবি

মাঝে মাঝে অনুভবের জগতে
ছবিগুলো বড়ো উল্টেপাল্টে যাচ্ছে,
এখন আর চেনা যাচ্ছে না।

আমার ছবি আমার নিজের কাছেই
এক এক সময় অস্পষ্ট ;
চারদিকে যেন ধুলোর ঝড় উঠেছে,
মাঝরাতে অন্ধকারে
তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি ;

এখনই প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে,
আমি কোনদিকে দৌড়বো ?

তোমার ছবিও এখন চেনা যাচ্ছে না,
এক সময় মনে হয়
দারুণ অবিশ্বাসী ঘাতক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ;
তাঁবু ভাঙলেও আমি বেরুতে পারবো না ।

এক এক সময়

এক এক সময় কলকাতা নিঃসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে চলে যায় ।
রাত্রি গভীরতর হ'লে চৌরঙ্গী জনহীন,
গির্জার ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা ;
সিনেমার শেষ প্রদর্শনী
ভেঙেছে অনেকক্ষণ,
সারাদিনের কাজের ক্লান্তির শেষে
দরোয়ান খানসামা ভিক্ষুক এমন কি বারবনিতারা,
ক্লান্ত পা'য়ে কখন অন্তর্হিত ।

চৌরঙ্গীর দিগন্তব্যাপ্ত মাঠ
কচি সবুজ ঘাস
কার্জন পার্কের বেঞ্চিগুলো এদিক ওদিক,
সারি সারি গাছ তখন অনন্ত নির্জনতার মধ্যে
এ ওর গায়ে জড়াজড়ি ক'রে
শুয়ে থাকে ;
গঙ্গা থেকে হাওয়া আসে,
লাইট পোস্টগুলো পিচঢালা পথে
অন্ধকারকে গাঢ়তর করে ;
চৌমাথার কালো ঘড়ির কাঁটা দুটো

হ্লে ওঠে কখন
পরস্পরকে কাছে, আরো কাছে টেনে নিয়ে
আবার ক্রমশই দূরে, ক্রমে আরো দূরে,
চলে যেতে চায়।
অন্ধকারে স্ট্যাচুগুলো তখনো নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে,
মনে হয় নিস্তব্ধতা এইসব মহান মানুষদেরও
বোবা এবং বধির ক'রে দিতে পারে।

এক এক সময় কলকাতা নিঃসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে
তলিয়ে যায়।

এখন কিছুক্ষণ

আমি বৃষ্টির শব্দ শুনতে চাই কিছুক্ষণ।
টালার ট্যাঙ্ক উপচে সব জল ঝরে যাচ্ছে,
হাইড্রাণ্ট খুলে দিয়েছে কেউ,
এক একটা রাস্তা জলে ডুবে যাচ্ছে,
এ রকম দৃশ্য দেখতে চাই।

বড়ো তেজি রৌদ্র, পিচের রাস্তায় গাছপালা
আগুনের হাওয়ায় হো হো ক'রে উঠছে;
মাঠের দিকে ঘোড়ার গাড়ির অশক্ত ঘোড়াটা
মুখ থুবড়ে পড়লো। এখন সারা শরীরে
গ্রীষ্মের নখর। এখন অন্তত কিছুক্ষণ
জলের নির্ঝরে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যে
সমস্ত জগৎ আমার মতোই কাঁপছে।

এই এক সময়

আমার বাড়ি আমি অন্ধকারেও চিনতে পারি।
এই এক সময় যখন
আলো স্পষ্ট নয়, দিন আর রাত এক রকম,
আলো ঝাপসা হতে হতে ক্রমশই
গভীরতর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কে আমার টুঁটি চেপে ধরবে বলে পেছন থেকে আসছে,
কে আমাকে বুকের মধ্যে নেবার জন্যে
সামনেই হাত বাড়িয়েছে,
কোথায় কুয়াশার পেছনে নক্ষত্রমালা,
কোনদিকে নদীতে জলোচ্ছ্বাস…

এই এক সময় যখন অন্ধকারেই সব চিনে নিতে হবে।

হে সময়, হে পৃথিবী

আমাকে হত্যা করার আগে
একবার ভেবে দেখো
আমি কোন দেশে জন্মেছিলাম।
আমাকে ছিন্নভিন্ন করবার আগে
একবার মনে রেখো
আমি কোন স্বপ্ন বুকে রেখেছিলাম।
আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে
যেন ভয়াবহভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছি,
সময়ের ফালে ওপরানো
অন্ধকার ঢিবিগুলো
হৃদয়ের মাঠ জুড়ে ছড়ানো:

আমি চেষ্টা করেও
এড়িয়ে যেতে পারছি না।

অন্ধকারে কি কখনো
রক্তের ফোঁটাগুলি
তোমাদের পবিত্র যজ্ঞের আগুন হয়ে জ্বলবে ?
রাতের সপ্তর্ষিরা কি তখন
লোহিত শোণিতবাহী নদী থেকে
খুঁজে পাবে তাদের পবিত্র পিপাসার জল ?
আমাকে হত্যা করার আগে,
ছিন্নভিন্ন করবার আগে
হে সময়, হে পৃথিবী
এসব জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিও।

ভাষা বুঝলে

ভাষা বুঝলে কাছাকাছি আসা যায়
তখন
জল পড়ার শব্দে
জানলার হাওয়ার কম্পনে
অনুভবের প্রজাপতিগুলো
বুকের মধ্যে ফিরে আসে।

তখন গাছের ছায়ায়
বটফলগুলোর দিকে তাকিয়ে
নির্জনতায়
এক সঙ্গে বসতে পারা যায়।

সময় নেই

কেন সারাক্ষণ এই করুণ গুঞ্জরণ বুকেরমধ্যে,
নেই নেই সময় যে নেই—
এই তো এই মুহূর্তগুলো
আমার আদরের পোষা বেড়ালটার মতো নিঃশব্দে
বারান্দার ওধার দিয়ে চলে যাচ্ছে,
আমি বুকে তুলে নিতে পারছি না।

নেই নেই সময় যে নেই
কে যেন বুকের সবচেয়ে নিভৃত দরজায়
দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর···
ওঠো খোলো চেয়ে দ্যাখো একবার
বড়ো দ্রুত সরে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো,
তোমাকে শেষবারের মতো সব গুছিয়ে নিতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যে

জানোয়ারের তাড়া খাওয়া মানুষের মতো
চলতে চলতে অন্ধকারের মধ্যে
ওরা পরস্পরের কাঁধে
হাত রাখলো ; ম্লান হেসে বললো :
আমরা হারিনি, ওরাও জেতেনি :
ঐ দ্যাখো অনন্ত নীলিমা
নক্ষত্রমালায় আমাদের পথকে
স্পষ্টতর ক'রে তুলছে ;

ঐ দ্যাখো সারি সারি বৃক্ষ
প্রগাঢ় মমতায়
আমাদের ধৈর্য আর সংকল্পকে
জানিয়ে দিচ্ছে কী ক'রে প্রতীক্ষা করতে হয়

স্মৃতিতরঙ্গ

বাইরে থেকে অন্ধকারে কে যেন ডাকল ঃ
'কিরণশঙ্কর, কিরণশঙ্কর'
হু-হু ক'রে উঠলো হাওয়া, দমকা দীর্ঘশ্বাসের মতো
উড়লো ধুলোবালি,
এই মধ্যরাতে কে যেন ডাকছে ভেবে
অন্ধকার ভেঙে ভেঙে এক নিমেষেই
দোরগোড়ায় এলাম।

না, কোথায় হাওয়া কোথায় ধুলোবালি!
কৃষ্ণচূড়া স্থির, একটি পাতাও নড়ছে না ;
সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে ল্যাম্প-পোস্টের আলো
একচক্ষু জগদ্দল মোষের মতো
তাকিয়ে আছে।

কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি

ধাক্কা দিলেই দরজা খুলে যায়,
এ রকম নয়,
ঝাঁকুনিতে সব ফুল ঝরে' পড়বে
এ রকম নয় ;
তার ছুঁতে পারলেই বীণার ঝঙ্কার,
এ রকম নয়।

কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি।
তবু বুকের মধ্যে থেকে-থেকে
মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে
এ কি বিষাদ!

ভালোবাসার মন্ত্র

ভালোবাসার মন্ত্র অনেক আছে, একটি দাও।
আমি কেন সর্বস্ব খুইয়ে
বোকার মতো বসে থাকবো ?
শিকারী বেড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে
এক একটি নিমেষ,
পাখির পালকের মতো নরম স্বপ্নগুলির পিছনে
এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমি সমস্ত রাত অন্ধকারে ছুটোছুটি ক'রে
এখন বড়ো ক্লান্ত ;
কে শত্রু কে আমার ভাই বুঝে উঠতে পারছি না ;
আমি কি সর্বস্ব খুইয়ে
বোকার মতো বসে থাকবো !

ভালোবাসার মন্ত্র পেলে আমি অনেক কিছু করতে পারি।

হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিলো

হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিলো সন্ধ্যায়
খেলছিলো গাছের ডালাপালার সঙ্গে
নেচে নেচে
চারদিকে আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে
দৃশ্যদৃশ্যান্তর
আলোড়িত করে।

হঠাৎ হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গেলো,
গাছের শাখাপ্রশাখা স্থির,
যেন একতাল কালি কেউ
সমস্ত আকাশে মাখিয়ে দিয়ে
দৈত্যের মতো বুক টান করে মিলিয়ে গেলো।

একা

নদীর জলে ঢেউয়ের ছলছল শব্দ ;
খুব নীচে জলের ওপর দিয়ে
কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছে,
আমার বুকে তাদের ডানার স্পন্দন

আর বিষণ্ণতা ;

কারা যেন আমাকে একলা ফেলে
চলে যাচ্ছে···

কবিতার জন্ম

সব সময় নয়
কিন্তু যখন আসে, আমি বুঝতে পারি।
ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে দ্বিতীয় সত্তা,
সমস্ত অস্তিত্বকে কিছুক্ষণের জন্যে
একটা সদ্যোজাত গন্ধের মতো মনে হয়।
কিংবা যেন কোথাও
ঝর্ণার জলের শব্দ, কেউ স্নান করছে গোপনে, সম্পূর্ণ নগ্ন।
মনে হয় ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি সেই জায়গায় যেখানে
ফিরে পাওয়া যায় সম্পূর্ণতা ;
বন্ধ দরজা খুলে যায়, ভেসে আসে
এক মুঠো শেফালির গন্ধ, কিংবা আকাশ-গলানো
হঠাৎ আলোর শুভ্রতা।

যখন আসে, আমি বুঝতে পারি।

কখন সময় হবে

ইচ্ছে হলেই সব হয় না অপেক্ষা করতে হয়।
অঙ্কুর থেকে আস্তে আস্তে ফুল
সময় লাগে :
বীজ থেকে আস্তে আস্তে ধান
সময় লাগে,
বাষ্প থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি
সময় লাগে ;
অনুভব থেকে আস্তে আস্তে প্রেম
সময় লাগে।

সময় লাগে সময় লাগে অথচ সময় নেই।
ধৈর্য তার প্রতীক্ষার দুই তীরে
নগ্ন পায়ে দাঁড়িয়ে আছি সবাই।
কখন সময় হবে!

রাত্রি থেকে আরো রাত্রি

রাত্রি থেকে আরো রাত্রি গাঢ়তর হলে
কে যেন হাটের পথে আরো নিঃসঙ্গতা
ঢেলে দেয় অন্ধকার ছেনে ;
কে যেন আকাশ থেকে নক্ষত্রকে কেড়ে নিয়ে যায়

পৃথিবী রাতের অন্ধকারে
জেগে ওঠে, সুকেশ নারীর মতো
চুল খুলে চুল বাঁধে,
যেন এই অন্ধকার তার যতো সাধের সময়।

রাত গভীর হ'লেই

রাত গভীর হ'লেই
আমার মনে পড়ে
এখনো সম্পূর্ণ করবার মতো বহু কাজ
বাকি র'য়ে গেছে।

বালিশে মাথা রেখে চিৎ হ'য়ে শু'লে
বড়ো সুশৃঙ্খল মনে হয় নিজেকে ;
জানলার ফাঁক দিয়ে তাকালেই
নীলিমায় দেখা যায়
অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ; অথচ রাত পোহালেই
দিনের বেলা মাঠে-মাঠে
তাজা যৌবনের অঙ্গীকারের মতো
অবারিত রৌদ্র।
দিনের আলো ম্লান হ'য়ে এলেই মনে হয়
অনেক কিছু বাকি র'য়ে গেল ;
এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় গতিবেগ কিলোমিটার
বাড়িয়ে যেতে হবে।

উনি বলেছিলেন

উনি বলেছিলেন সব করে দেব, সব পাবেন
ফসলের জন্য বীজ,
বীজের জন্যে সার—
জলের জন্যে কল।
উনি বলেছিলেন এ আর বেশী কি সব পাবেন।
শুনতে পাই উনি কলকাতায় থাকেন সরকারী হোস্টেলে
শুনেছি উনি বাড়ী করেছেন বনেদী পাড়ায়।

মাঝে মাঝেই সন্ধ্যা হলেই চলে যান নাকি বেপাড়ায়
আছেন দিব্যি মজা করেই শহরে।

উনি বলেছিলেন সব করে দেব, সব পাবেন।
ফসলের জন্যে বীজ
বীজের জন্যে সার—
সেচের জন্যে জল।
শহর থেকে ফিরলেই উনি এসব দেবেন।

আত্মগত

মাঝে মাঝে রাতের গভীর অন্ধকারের ভেতর থেকে
অদ্ভুত হা হা শব্দ—
যখন ঘুম আসছে না, শোনা যায় সেই হা হা ধ্বনি
লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে আসছে,
ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো
আছড়ে পড়ছে পুরনো বাড়ির বন্ধ দরজায়।
নিশ্বাসও যেন তখন কী রকম তোলপাড় করতে থাকে
বুকের মধ্যে :
কপালে ঘাম জমছে
বাইরের গাছের পাতাগুলো যেন শুনছে
আমার নিশ্বাস পতনের শব্দ ঃ
এক হাজার গাছের ঝরা পাতার মতো
আমার নিশ্বাস।
আমি যেন মধ্যরাতে হাজার বছর আগেকার
ক্রীতদাসবাহিত রথচক্র ঘর্ঘরের
শব্দ শুনছি।

হত্যাকারী কেউ নেই

হত্যাকারী কেউ নেই সবাই সাধু বনে গিয়েছে।
আমি স্বপ্নের ভেতরে দেখছি
হাজার হাজার গেরুয়া সাধুর মিছিল
পার্বত্য পথের বাঁকে
কুম্ভমেলার দিকে যাত্রা করেছে।
সব অস্ত্র কি তাহলে ফিরে এসেছে অস্ত্রাগারে,
এখন সব দুর্বৃত্ত বর্মহীন ?

নদীর জলে হাত ধুয়ে গেরুয়া পরে
এখন সবাই মহতী সভায় প্রবক্তা।
স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখছি
নদীর জল গাঢ় লাল, স্রোতের টানে
হাজার হাজার কিশোরের লাশ জলে ভেসে যাচ্ছে।

শয়তানকে বড়ো পিঁড়ি

শয়তানকে মাঝে মধ্যে বড়ো পিঁড়ি দিতে হয়—
মুখে তখন খুসীর ঝলক,
যেন বহুকাল ধরে এরকম ভাবেই চলবে ;
তাকে খোস মেজাজে রাখতে
স্নানের ঘর থেকে রান্নাঘর অবধি সর্বত্র ব্যস্ততা।

শয়তানকে মাঝে মাঝে বড়ো পিঁড়িতে বসাতে হয়—
যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাবেই
ফুলদানিতে ফুল, জানালায় রঙীন পর্দা,
বিছানায় ধবধবে চাদর……

অন্ধকারের ভিতর

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে।
ছেলেরা খেলছে পার্কে,
মেয়েরা হাসছে, পরনে লাল নীল জামা ;
মাঠের এক-এক কোণে বসে আছে দু'টি-তিনটি
দম্পতি,
হাতের লাঠিতে ভর ক'রে খোলা হাওয়ায়
বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে
একসঙ্গে দু'তিনজন বৃদ্ধ।

সমস্ত দৃশ্যটাই একটি ছবির মতো
সময়ের দেয়ালে ঝুলতে থাকে
কিছুক্ষণের জন্যে :
তারপর একসময় মিলিয়ে যায়
অসীম শূন্যতার অন্ধকারের ভিতর।

ভোরের এই মুহূর্তে

খুব ভোরে ভাঙা ভাঙা আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে
প্রথম ট্রেন
সেই অতি-পরিচিত শব্দ তরঙ্গ তুলে
বেরিয়ে গেল।
এখনো চারদিকে আবছা অন্ধকার,
আলোগুলো নিভে যায়নি,
দূরে সবে শুরু হয়েছে একটি নতুন স্পন্দন,
মসজিদে আজান,
মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি,
গীর্জার ঘড়িতে প্রহরমস্থিত শব্দ।

এই মুহূর্তে সব কিছুই পবিত্র মনে হয়,
যেন পরিপূর্ণ একটা জীবন শুরু হতে যাচ্ছে ;
ফুল ফুটে উঠছে চারদিকের গাছগুলোতে,
কাছেই কোথাও ঝর্ণার জলের মতো শব্দ,
বুকের মধ্যে হারানো পাখির ডাক।
এরকম মুহূর্তে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন সঞ্জীবতা ফিরে আসে,
এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায়
ভিজে ওঠে ঠোঁট আর চিবুক,
আবার নতুন ক'রে শুরু করবার জন্যে
ভোরের এই মুহূর্তটি
সবাইকে যেন জাগিয়ে দিয়ে যায়।

জলের ধারে এক মুহূর্ত

পদ্মগুলো এখনো জলে ভেসে আসে,
চোখ তুলে তাকালেই সামনে
নীলাভ নীলিমার আভাস।
এক ঝাঁক পাখির কাকলিতে
জলের মধ্যে মাছের আনাগোনায়
হঠাৎ যেন বহুকালের হারানো দৃশ্য
ফিরে আসে।

আমি জলের ধারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখি,
টলটল করছে আমার মুখ
স্থির জলের বিচিত্র দর্পণে।
তারপর ঢেউ এলেই কেঁপে ওঠে পটভূমি,
সব দৃশ্য মিলিয়ে যায়।

আনন্দ, বেদনা

আনন্দের ভাষা আর বেদনার ভাষা
সব এই বুকে।
অনুভব ক্ষয়ে যায় মনের অসুখে
সমস্ত শরীরে বিকেলের
ম্লান নিশ্চলতা।

আনন্দের ভাষা আর বেদনার ভাষা
যেন সহোদরা ;
এক চোখে আলো আর অন্য চোখে জল,
চলে বোঝাপড়া
দুই পা ছড়িয়ে বসে বিরল নিমেষে ;
যখন চোখের ঘুমে
সব স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে।

এই হাওয়া

এখানে এখনো বৃষ্টি নামেনি, শুধু হাওয়া,
দারুণ হাওয়ায় পর্দা উড়ছে,
টেবিল থেকে ওই উড়ে পালালো খবরের কাগজ ;
পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটি পুরনো পোস্টকার্ড
উড়ে এসে দু'দণ্ড দাঁড়ালো জানালার পাশে,
তারপর পাখা মেলে আবার কোথাও উধাও !

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই
আবার কবন্ধ অন্ধকার
ভিড় করে আসবে।

মনে রেখো
রক্তাক্ষরে প্রতিশ্রুতিগুলো লিখে
তুমি সবাইকে পড়িয়েছিলে ;
সূর্যের দিকে তাকিয়ে
নদীর দিকে মুখ রেখে
তুমি নতুন যাত্রার কথা শুনিয়েছিলে।

জন্মদিনে

কন্যা, এখানে এসেছ আজ
ক্রান্তির দিনে সোজাসুজি ;
গোটা পৃথিবীটা তোলে আওয়াজ,
জীবনে-মরণে যোঝাযুঝি !
চারদিক থেকে তেড়ে আসে
অকালের বান চোখা-চোখা ;
ছড়ানো জহর আশেপাশে,
তবু তুমি এলে একরোখা !

নতুন জীবন হাত-পা ছড়ায়,
আকাশের নীল দুটি চোখে,
মুখর কাকলি হৃদয় ভরায়,
অমরার আলো মরলোকে !

বাহিরে পৃথিবী ঝড়ো হাওয়ায়
আহত জটায়ু, আকাশ লাল ;

মাঠে-জনপদে হায়রে হায়
এখনো যে জোটে পঙ্গপাল।
চোরা-কণ্টকে ভরা যে পথ,
পথের খোদলে অন্ধকার ;
চোরা বালুকায় সবেগ রথ
অনেক ভেঙেছে, রুদ্ধ দ্বার।

তবু তো কন্যা তুমি এলে
হৃদয়ে যখন কঠিন ভার ;
নবজীবনের আলো জ্বেলে
ঘুচাবে কি যত অন্ধকার !

খেয়েছি যুগের কড়া চাবুক,
ঘরে-ঘরে সবাই, উপবাসী ;
শাসনে শোষণে ভেঙেছে বুক,
নিজ বাসভূমে পরবাসী।
উদরে অন্ন জোটেনি তাই
হয়েছি উধাও, ভবঘুরে ;
হৃদয় কেঁপেছে শুনেছি যেই
প্রভুর হুকুম, কড়া সুরে।

তবু তো কন্যা পেয়েছি টের
দিন-বদলের নেই বাকী :
দমকা হাওয়ায় ঝড়ের জের,
হৃদয়ে প্রদীপ জ্বেলে রাখি।
নতুন যুগের প্রতিনিধি
তুমি কি কন্যা, আরো কি কেউ
শৃঙ্খলহীন নয়া বিধি
তোমরা আনবে, জাগাবে ঢেউ।

এরকম জ্যোৎস্নায়

এরকম জ্যোৎস্নায় আমার সমস্ত মুহূর্তগুলোকে
বুকের মধ্যে নিয়ে আসি।
সেই যে একবার
অশ্বত্থ গাছের নীচে আমরা ক'টি যুবক
গোল হয়ে বসেছিলাম,
একজন হঠাৎ সাঁতরে চলে গিয়েছিল
নদীর অপর পারে,
ফেরার সময়
তলিয়ে গিয়েছিল গভীর জলে,
আর ফেরেনি।

এরকম জ্যোৎস্নায় আমি প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম,
পুলিশের চোখ এড়িয়ে
অন্ধকারের দিকে তোমার অগস্ত্য যাত্রা :
তোমার ক্লান্ত শরীর মাটিতে পড়তেই
তারস্বরে ডেকে উঠেছিল
কয়েকটা অবুঝ পাখি।
মনে পড়ে
রাত একটায় বাড়ির দরজায়
দুমদাম শব্দ,
ওরা তোমার একুশ বছরের ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল,
সে আর ফিরে আসেনি।

এই সন্ধ্যা

সারাটা দিন আলো ছুটোপুটি খেললো হাওয়ার সঙ্গে
তারপর অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

ছেলেবেলায় জলপরীদের কথা শুনেছিলাম, মনে হয়
এখন এই মুহূর্তে কাছেই কোথাও তারা ঝর্ণার নিচে
স্নান শেষ ক'রে ফিরে যাচ্ছে ;
একটু বাদেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের পরিত্যক্ত ছিন্নমালা
চোখ ফেরাতেই চোখে পড়লো সেই চিরকালীন চাঁদ,
এখন তার মুখের রেখায় দারুণ ক্লান্তি।

এরকম সান্ধ্য নির্জনতায় আমি মাঝে-মাঝে
পবিত্র উপবীতের সন্ধান করি ;
পূর্বপুরুষের সান্নিধ্যকে ফিরে পেতে চাই একবার,
পরমুহূর্তেই কয়েকটি বাদুড়ের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে
সমস্ত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

মধ্যরাত্রি, ভোর

মধ্যরাতে আমি টলতে থাকি, নিরুপায়,
সারা শরীরে ক্লান্তি ;
যেন শরতের আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে
শীতের কুয়াশায়,
আমার স্মৃতির ভেতর ক্লান্তির অন্ধকার
ধীরে ধীরে নেমে আসে।

অথচ কতো ভাল লাগে ভোরের আবির্ভাব,
সব কুয়াশা কেটে গিয়ে স্বচ্ছ সূর্যোদয়,

যেন মহাকাশ মেঘের পাহাড় পেরিয়ে
সূর্যদেব এলেন তাঁর সাতঘোড়ার গাড়িতে
দিগন্ত রাঙিয়ে।
প্রতিটি সূর্যোদয়ে এক একবার
নতুন ক'রে আশা আর ভালোবাসা হৃদয়কে
ছুঁয়ে যায়,
আবার নতুন উদ্যোগে জয়ী হবার জন্যে।

কবিতা চাইলে

আমার কাছে কবিতা চাইলেই
আমি আকাশ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ি,
পাহাড় চূড়া থেকে গড়িয়ে নামি
নিচের সমতলে।

আমার কাছে কবিতা চাইলেই
ঘরের পুরনো ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে,
ওরা কয়েক নিমেষের জন্যে
আমার স্মৃতিতে তোলে তরঙ্গ,
এক অবিশ্বাস্য আলো হাওয়ার জগতের দিকে
নিয়ে যেতে চায়।

আমার কাছে কবিতা চাইলেই
আমি ড্রয়ার হাতড়ে ঘুমের ওষুধ খুঁজতে থাকি।

একদিন

কাঠের সিঁড়িটা অনেক বড়, পেরোতে সময় লাগে।
নিচে একতাল মেঘের মতো জমাট অন্ধকার,
উপরের দিকে ইলেকট্রিক বাল্‌বের আলো।
পাঁচতলায় যেতে শরীর কেঁপে ওঠে ;
নিচের দিকে নামতেই
কেমন যেন পা পিছলে যায়।

এ রকম ভাবেই চলতে হবে সময় সময়,
এ রকম ভাবেই পা পিছলে যাবার ভয়।

চার তলায় উঠতে গিয়ে দম নিতে হয়,
নামতে গেলেও আস্তে, আরও আস্তে, ধীরে আরও ধীরে

এ রকম ভাবে চলতে চলতে একদিন
চোখের সামনে সমস্ত আলো নিভে যায়।

পোস্টার

পোস্টারগুলো এখনো মুছে যায় নি। দেয়ালের
অক্ষরগুলো অস্পষ্ট, কিন্তু নিমেষেই
সবটা পড়ে ফেলা যায়। কয়েক বছরের
রোদ বৃষ্টি হাওয়া
বারংবার হানা দিয়েছে দেয়ালটার জরাজীর্ণ শরীরে
বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা হয়েছে তার শরীর
আবার গ্রীষ্মের তপ্ত রৌদ্রে উত্তপ্ত।
তবু অক্ষরগুলো পড়া যায়,
একটু মনোযোগী হলে
ফাঁক ক'রে দেখা যায়

বিশ দফা কর্মসূচীর রহস্য ;
সূর্য ঘুরে যেতে আলো পড়তেই
জ্বলজ্বল করতে থাকে অক্ষরগুলো

ভোরের এই মুহূর্তটি

খুব ভোরবেলা দেখতাম
তোমরা যাত্রা শুরু করেছ।
তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?
ভোরবেলা কেউ যাত্রা শুরু করলেই
আমি মাথা বাড়িয়ে জানালার
বাইরের আকাশটাকে
ভালো করে দেখে নিতে চেষ্টা করি।

এখন আকাশ বড়ো নির্মল,
এখন সমস্ত নীলিমায় মেঘের স্তরে প্রশান্তি,
যেন ঘুমের মধ্যে চোখ বুজে থাক।
শিশুর সুন্দর মুখচ্ছবি।

সূর্য সবে উঠছে, ভোরের সূর্যের
প্রথম আভাকে সিঁদুরের মতো
পবিত্র মনে হয়।

সমস্ত রাত

সমস্ত রাত সে হাহা করে আকাশের নিঃসঙ্গতায়।
যেন একটি দীর্ঘাঙ্গী এলোকেশী কালো মেয়ে
অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে গেছে—তাকে
খুঁজে বেড়ায়।

চোখ ফেরালেই

সময়ের দিকে চোখ ফেরালেই দৃষ্টি ঝাপসা
হ'য়ে আসে !
এখন যৌবনস্মৃতি অস্পষ্ট। যেন বহুকাল আগের
ভোরের কুয়াশায়
পাখির ডাক—বুকের মধ্যে কোথাও মিশে আছে।

সেই যে কবে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম.
ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, মা-বাবা তখন বেঁচে ;
আমি ফিরে আসব ভেবে একটি ছোট কৃষ্ণচূড়া
গাছের দিকে
তাকিয়েছিলেন আমার মা, ভেবেছিলেন
ফিরে এসে অনেক বড়ো একটা গাছের ছায়ায় আমি
অবাক হয়ে দাঁড়াবো।

নিজের ঘরে ফিরতে পারিনি, সামনের কোনো ঠিকানায়ও
পৌঁছাতে পারছি না ;
বিকেলে শেষ রোদে দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট কৃষ্ণচূড়ার গাছের
কথা মনে পড়ে.
আমার মা যাকে অনেক যত্নে লালন করেছিলেন।

যতো দিন যায়

যতো দিন যায়
তোমার মুখ আমার চোখের সামনে
অস্পষ্ট হয়ে আসে।
যেন তুমি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছ দূরবর্তী টিলার দিকে,
মিলিয়ে যাচ্ছ দিগন্তরেখায়।

যেন বর্ষার ঝরঝর বর্ষণের ভেতরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
বৃষ্টির ছাঁটে ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে দেখার মতো
তোমার মুখের ছবি অস্পষ্ট ;
যেন শীতের কুয়াশার পৃথিবীতে প্রকাণ্ড খোলা
মাঠের মধ্যে
আশ্চর্য শান্ত পায়ে তুমি হেঁটে চলেছ,
ভালো ক'রে তাকাতে গেলেই
দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

বুট জুতো পরে কালান্তক কাল ঠিক যেন আমার
ঘরের বাইরে
অন্ধকারে পায়চারি করছে,
একবার বেরুলেই আমাকে নিয়ে যাবে।

স্বপ্ন

নদীর স্রোতে পাড় ভাঙছে অবিরাম,
আর জায়গা নেই,
সাত পুরুষের ভিটে ছিল একদিন
সুন্দর ছবির মতো ;
আজ সব ছেড়ে সরে আসতে হয়।
দু'চোখের স্বপ্ন, একদিন যা লালিত ছিল
গোপন অস্তিত্বের গভীরে,
আজ কতো সহজেই না
দেখা যাচ্ছে তার ভূলুণ্ঠিত রূপ।

অথচ স্বপ্নকে ছেড়ে কেউ কোথাও
যেতে পারছে না।

এখন তুমি

এখন শরৎ ঋতু এসে যাচ্ছে।
বহুদিনের পুরনো একটি মুখের মতো
তার স্মৃতি,
আকাশের দিকে তাকালে
মাঠের দিকে তাকালে
চোখে স্বপ্নের ছোঁয়াচ লাগে।

এখন শরৎকাল এসে যাচ্ছে।
তুমি এখন দেখছো নীলিমায়
শাদা মেঘের রহস্য,
আর নদীর ওপারে
কাশফুলের বিস্তার।
যেন তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে
এসে পড়েছ,
সমগ্র নিসর্গ প্রকৃতি এখন
তোমার বান্ধবী;
তুমি ইচ্ছে করলেই তার হাত
ছুঁতে পারো।

এখন তুমি বহুকালের তিক্ততা ভুলে
পরিশুদ্ধ হবার জন্যে
প্রকৃতির কাছে নতুন পাঠ নেবে।

কবিতা : সত্তর দশক

তাহলে কবিতা কি শুধু ফোটাবে গোলাপ ;
এক মুহূর্তে জাগিয়ে তুলবে
হৃদয়ের গভীরতায়
ঝর্ণার কল্লোলধ্বনি ?
নাকি মাঝরাতের চাঁদের মতোই
এসে দাঁড়াবে নীলিমায়, মুখে হাসি,
ছড়িয়ে দেবে অমল জ্যোৎস্না
প্রান্তরে, পাহাড় চূড়ায় !

তাহলে কবিতা কি শুধু জাগিয়ে তুলবে
বসন্তের হাওয়ায় চঞ্চলতা,
যখন গাছের শাখা মাথা দুলিয়ে জেগে ওঠে,
জানায় আমন্ত্রণ !
নাকি কবিতা কোনো প্রেমিকের গোপন ফিসফিসানি,
অভিসারিতার গুঞ্জন
যখন মধ্যরাতে সারা পৃথিবী গভীর ঘুমে নিমগ্ন ?

কবিতা এরকম সব কিছুই হতে পারত,
অথচ এখন তা নয় !
কবিতা এখন পুরনো পোষাক একেবারেই খুলে ফেলতে চায়
মাথায় কাঁটার মুকুট পরে স্বেদ আর শ্রমের ভেতর
পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়,
ঠোঁটে নোনতা স্বাদ, চিবুকে ক্ষতচিহ্ন···

কথাগুলো

কথা শুনতে শুনতে
কথা শুনতে শুনতে
অনেক বছর পার হয়ে গেল।

এখন শব্দগুলো কানে এলেই
গা জ্বালা করে,
চোখে জ্বলতে থাকে ঘৃণা।

বানানো কথা এত কুৎসিৎ হয়!
একবার আগুন জ্বেলে দিতে পারলেই
অবাধ্য পোকাগুলোর হাত থেকে
রক্ষা পাওয়া যায়।

এক লাফে আকাশে

একটি দুটি ক'রে নয় একশো দুশো করেই
ওদের সংখ্যা বাড়ছে অগোচরে
রেল লাইনের দু'ধারের খোলা জায়গায়,
প্ল্যাটফর্ম-এ ফুটপাতে বস্তিতে,
চৌদ্দতলা বাড়ির কোণে।
এখান থেকে ওখানে হাত বাড়িয়ে
ওরা কুড়িয়ে আনছে উচ্ছিষ্ট, খরকুটো···

ওরা একেবারেই মূর্খ
নইলে জানতে পারতো নিজেদের ভবিষ্যৎ :
সন্ধ্যার পর বেতারের ঘোষণায়

শোনা যায় সেই দারুণ খবর :
ওদের জন্যে এক হাজার প্রকল্প তৈরী ;
ওরা অল্পকালের মধ্যে, কত অনায়াসে,
স্বর্গের সিঁড়ি ধরে একলাফে আকাশে
পৌঁছে যাবে।

একমাত্র তখনই

অনেকগুলো লোককে জড়ো করলেই মিছিল হয় না,
ওদের সচেতন করো ;
যখন ঝড় আসে গাছপালাগুলো নুয়ে পড়ে,
ঝড় থামতেই
আবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় আকাশের নীচে,
ওদের জানতে দাও গাছের স্বভাব।

ওরা এখন মাথা নিচু ক'রে আছে, সেভাবেই
ওদের থাকতে দাও।
ওদের সামনে পেছনে সারিবদ্ধ বুটের শব্দ,
মাথা তুললেই মৃত্যু।

তুমি খুঁজে বের করো, কোথায় ওদের আশ্রয়।
কতকগুলো লোককে আগুনের কুণ্ডে ঠেলা দেয়া নয়,
আগুনের তাপে
এখন নিজেদের সেঁকে নেয়ার সময়।

একবার দেখে নিও

যাত্রা শুরু হবার আগে
একবার দেখে নিও
যারা তোমাকে সামনে রেখে কথাগুলো বলছে
তারা সামনে থাকবে কিনা।

গাছে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে রেখে
এখন অনেকেই
যার যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত ;
অন্ধকারের দিকে রাস্তা বরাবর চলতে
শুরু করলেই
তখন এক সময় চতুর্দিক ফাঁকা হয়ে যায়।

রাজেশ্বরী

আকাশের নীলিমায় ছড়ানো রয়েছে
রূপসী জ্যোৎস্নার অমল শরীর,
যেন ধবধবে শাদা পালঙ্কে এলিয়ে রয়েছে
রাজেশ্বরী ;
খোলা মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেঁপে উঠছে
মৌন বৃক্ষের পাতাগুলি ;
এখন শাদা আলোর তোরণের ভিতর দিয়ে
যে-কোনো দিকে পৌঁছে যাবার সময়।

এই ফাল্গুনের হাওয়া

[সোমেন চন্দের স্মৃতিতে]

মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই প্রকৃতির বিশালতা
চোখে পড়ে ,
তখন সমুদ্রের মধ্যে একটি জলবিন্দুর মতো
নিজেকে মনে হয় ;
আকাশের শূন্যতার ওপর দিয়ে
ফাল্গুনের হাওয়া হঠাৎ সব দৃশ্য কাঁপিয়ে দিয়ে
খুব দ্রুত বয়ে যায়.
প্রাচীন বটের শুকনো পাতাগুলো উড়ে পড়ে
চতুর্দিকে ;
উড়ন্ত প্রজাপতি দু'টি হাওয়ার টানে মিলিয়ে যায় ।

ফাল্গুনের হাওয়া দিলেই আমার অনেক পুরনো,
নাম মনে পড়ে,
কয়েকটি নাম এতো প্রিয় যে স্পর্শের মতো
অনুভব করি ;

ফাল্গুনের হাওয়ায় সব গোলমাল হ'য়ে যায় ।

মানুষ জানে

মানুষ জানে
দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত হয়েছে সুরা,
কয়লা থেকে আগুন,
চুম্বন থেকে গভীরতর ভালোবাসা ।

মানুষ জানে
দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কালো হাওয়ায়
কী ভাবে গড়ে তুলতে হয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।
মৃত্যুর ভ্রুকুটি উপেক্ষা ক'রে গভীরতর
অন্ধকারে
কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়।

মানুষ জানে
কী ভাবে জলকে রূপান্তরিত করা যায় বিদ্যুতে,
স্বপ্নকে নিয়ে আসা যায় বাস্তবের কাছাকাছি
কুয়াশার তোরণের মধ্য দিয়ে
কোন যাদুতে এক সময়
অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে
আবার ফিরে আসা যায় আলোর দিকে,
জীবনের দিকে।

একটি কথা

যদিও জড়তা সোনার শরীর ঘিরে,
অধরে আসুক সবহারাদের গান,
আকাশ যেখানে নেমেছে নদীর তীরে,
এখন সেখানে বোমারু বাষ্পযান।
বসন্ত এলো, সেকথা বলেনা কেউ।
হেসে নিও বসে' দু'দিন বই তো নয়;
স্তিমিত অধরে অযুত হাসির ঢেউ,
রাখো কূটনীতি, এছাড়া সকলি সয়!

ইতিহাসে পাতা উল্টায় বুঝি ফের,
রাতের প্রলাপ দিনের আলোয় ম্লান;

দরিয়ায় আজো তীব্র ঢেউয়ের জের,
এখন সেখানে সমর বাষ্পযান।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখা সার?
পুরনো প্রয়াস ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হয়,
সহসা পিছনে চকিত ছায়াটি কার!
নীলিম গভীর চোখের পাতায় ভয়।

কোনো ভয় নেই খুলেই তাহ'লে বলি,
আগত বিপদ সেদিকে ফেরাও কান।
এসো না কৃষাণ মজুরের সাথে চলি;
অধরে আসুক সবহারাদের গান!
সোনার ফসল, নেই তো আভাস তার,
পুরনো দিনের প্রলাপ না হয় থাক।
জমেছে যে সোনা এবারে চুলোয় যাক,
হে শ্বেত বণিক, শুধু বাণিজ্য সার!

ভাঙা পাহাড়ের কিনারে নিঝুম বাড়ী,
ধ্বসে পড়ে ভিৎ, বিরস করুণ ছবি।
আমাদের দিন পাথরের মতো ভারী
আমরা বিরাগে ভুলেছি শোভন সবি।
রাতের প্রলাপ দিনের আলোয় ম্লান;
ইতিহাসে পাতা উল্টোয় বুঝি ফের,
আগত বিপদ, সেদিকে ফেরাও কান,
আমার হৃদয়ে তোমার হাসির জের।

অভিমানী হাওয়া

অভিমানী হাওয়া আর ডাকবে না কখনো তোমাকে।
তখন কোথায় ছিলে যখন সে এসে
বারান্দায় ঘোরানো সিঁড়িতে
এবং তুলসীমঞ্চে, বকুলতলায়
ক্ষণিক তরঙ্গ তুলে মগ্ন হ'তে এসেছিল বুকে?

অভিমানী হাওয়া আর ডাকবে না নির্জনে তোমাকে।
তখন কোথায় ছিলে দিগন্তে যখন
মুঠি মুঠি মেঘগুলো সূর্যাস্ত-আলোয়
জ্বলে উঠে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবিরে
লীন হ'য়ে গেল?
যখন আমলকী গাছ শেষ রৌদ্র হ'তে মাথা তুলে
মুহূর্তে মিলিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে?

অভিমানী হাওয়া আর ডাকবে না কখনো তোমাকে
তখন কোথায় ছিলে যখন সে এসে
বর্ষণমুখর মধ্যরাতে
বিপন্ন বন্ধুর মতো অর্গলিত দ্বারে
রুদ্ধশ্বাস করাঘাতে ক্ষণিক আশ্রয়ে
ডেকে ডেকে গিয়েছিল ফিরে?

অথবা ঝড়ের শেষে ভোরের আলোয়
দ্রুত পায়ে চলে গেলে শেষ অন্ধকার
যখন এসেছে সে কোনো উপহার
পায়নি নির্জনে। ক্লান্ত চোখ
হয়নি উজ্জ্বলতর তখন তোমার।
মগ্ন ছিলে ঘুমের আশ্রয়ে
আলস্যমন্থর কোনো পরিতৃপ্ত মাছির মতন,
ব্যস্ত ছিলে নগণ্য সঞ্চয়ে।

অভিমানী হাওয়া তাই ডাকবে না আর
কখনো তোমাকে।
তুমি জানবে না এই হাওয়া তোমাকে কখনো
ডেকেছিল কিনা।
বারান্দায় ঘোরানো সিঁড়িতে
এবং তুলসীমঞ্চে বকুলতলায়
ক্ষণিক তরঙ্গ তুলে অন্তরঙ্গতায়
উচ্ছ্বাসত কিনা।

সেদিন মূর্খের মতো পাশ ফিরে তুমি শুয়েছিলে

দেয়াল

দেয়াল কাঁপছে এখনই ভেঙে পড়বে হয়তো,
দেয়ালে কারা যেন লাল অক্ষরে মোটা আঁচড়ে
অনেক কথা লিখে রেখেছিল,
এখন সেই অক্ষরগুলোও কাঁপছে মাটির কাঁপুনিতে
সেপাহী শান্ত্রীরা ট্রাকে ঘুরছে,
বার বার যাতায়াত করছে দেয়াল ঘেঁসে।
হুড়মুড় ক'রে দেয়াল ভেঙে পড়লেই
অক্ষরগুলো চাপা পড়বে
ধূলোয় আর ভগ্নস্তূপে।
অথচ বুকের ভিতরে কোথাও গভীরে
তারা নতুন দেয়াল তৈরী ক'রে ফেলেছে।

সুদেষ্ণার জন্মদিন

১. এইমাত্র পার্টি শেষ হ'লো। প্রত্যাবর্তনের মুখে
সুসজ্জিত সকলেই একবার ঠোঁটে হাসি এনে
বললো : 'তাহলে, ভারী ভালো লাগলো এবার এই
জন্মোৎসব।' কেউ কেউ আড়চোখে ঈষৎ কৌতুকে
দেখলো সুদেষ্ণা তার পুষ্ট দেহটাকে
কী ক'রে অমন মুগ্ধ ভঙ্গিমায় সাজিয়েছে
এবং কী ক'রে তার প্রৌঢ় স্বামী হরিবিষ্ণু রায়
সামাজিক ভব্যতার বিজ্ঞাপিত মান অভিনয়ে
অভ্যস্ত নটের মতো অকৃত্রিম দাক্ষিণ্য ছড়ায়।

২. কেউই এখন নেই ; ঘর স্তব্ধ, শান্ত অন্ধকারে
প্রাণ তার নিমজ্জিত আলোগুলো নিভলো যখন
এবং কাজের শেষে ঝি-চাকরেরা ফিরে গেল
যে-যার নির্দিষ্ট ঘরে। অন্ধকারে অলিন্দের ধারে
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো সুদেষ্ণা কখন
দাঁড়িয়েছে। হরিবিষ্ণু অন্যদিকে ঘরের শয্যায়
ফিরে গেছে ; প্রৌঢ় বয়সের ঘুম চোখের পাতায়।

৩. সুদেষ্ণা এখনো তার জন্মদিন প্রতিপালনের
দুর্ভেদ্য নিগড়ে বন্দী ; হরিবিষ্ণু নিজেই উদ্যোগী
এবং যুবতী পত্নী সুন্দরী ও সুশোভিত হলে
কোন্ না প্রৌঢ়ের মনে জাগে শান্ত বিদ্যুৎবিলাস!
সুদেষ্ণা সাতাশ আর হরিবিষ্ণু সম্প্রতি পঞ্চাশ
তবু যেন জন্মদিন দাম্পত্যের মার্জিত আশ্বাস।

৪. সুদেষ্ণা দাঁড়ালো এসে অন্ধকার বারান্দায়
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো। জন্মদিন তার
নির্জনে জাগিয়ে তোলে অন্য স্মৃতি। দেখা যায়
অদূরে বাগানে নীচে গাছে-গাছে ফুল
ফুটে আছে ; হঠাৎ হাওয়ার তীব্রতায়

মুঠিমুঠি গন্ধ ছাড়ে গোলাপ কি মালতী বকুল।
সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে থাকে, তার মনে প্রাণে
তখন স্মৃতির ঢেউ, প্রেমাংশুর সেই শান্ত মুখ
মনে পড়ে—যে প্রেমাংশু তাকে বহুবার
বলেছিল: 'তুমি ছাড়া আর কেউ জীবনে আমার
সত্য নয়, তুমিই আমার শতবার।'

৫. সুদেষ্ণা এখনো ভাবে: প্রেমাংশুর এই হিংস্রতার
কী দরকার ছিল? কুমারীর যুবতী শরীরে
যা কিছু গোপনলভ্য এবং শিল্পিত
অনবদ্য সুষমায় তার সাড়া পেয়েও কখন
প্রেমাংশু তলিয়ে গেল, পারলো না আর
প্রেমিকের মতো দীপ্ত মহীয়ান হতে।
ভেসে গেলো প্রলোভনে সময়ের স্রোতে
উচ্চ খেতাবের মোহে ধনী শ্বশুরের পাত্র হতে।

৬. সুদেষ্ণার জন্মদিন ভাষান্তরে স্মৃতি তর্পণের সেই দিন
যেদিন ঘৃণায় তার শুদ্ধ হয় প্রেমিকের ঋণ।

সব পেয়েছির দেশে

গান শুনতে শুনতে মনে হ'লো হঠাৎ
কেউ কাঁদছে কাছেই।
বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হ'লো ফের
কেউ বমি করছে কোথাও;
নির্জন যাত্রায় পথে হরিধ্বনি শুনতেই মনে হ'লো
শবযাত্রায় লোক পাওয়া যাচ্ছে।

তবে কি পৌঁছে গেলাম সব পেয়েছির দেশে?

কথাবার্তা

আপনাকে অনেক বছর বাদে দেখলাম।
তা ভালোই লাগছে দেখতে।
চুলে পাক ধরেছে ঈষৎ,
চশমার কাচ আরো পুরু হয়েছে
ভি আই পি-দের সেই মিশ্রিত হাসি
এখন আপনার ঠোঁটে।

শুনেছি নেমন্তন্ন বাড়ীতে ঢুকেই এখন
শুধু গন্ধ শুঁকেই
আপনি বলে দিতে পারেন কোথায়
গৃহস্বামীর গোপন সেলার।
সিগারেটের ব্র্যাণ্ড দেখে বলে দিতে পারেন
গৃহস্বামী দিনে ক' প্যাকেট
সিগারেট খান।

আপনার স্ত্রীকে জানতাম; এক সময় বেশ
আলাপও হয়েছিল,
সপ্রতিভ, মৃদুভাষিণী, অতিথি বৎসল;
শুনেছি একটিমাত্র মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর
তিনি সেই যে অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন
আজ পর্যন্ত ভুগছেন।

আপনার যৌবন কিন্তু যেতে যেতে যায়নি,
স্ত্রী যদি এরকম রুগ্ন না হতো
সংসার নিঃসন্দেহে বাড়তো।
আপাতত চুলে কলপ দিয়ে ধোপদুরস্ত
বাবু সেজে
আপনি সুযোগ পেলেই যান সভায়
সেখানে প্রতীক্ষারত সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে
হয়তো বয়সের কথা ভুলে যান।

আপনাকে অনেকেই খাতির করে একথাও
জেনে নিয়েছি ,
আর করবে নাই বা কেন, আপনারা তো
পত্রিকা জগতের লোক, কিং মেকার,
মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও নাকি যোগাযোগ রাখেন
নিজেদের গোপন স্বার্থে ,
তাছাড়া, আপনি নিজে তো একজন লেখক,
স্বনামধন্য সাহিত্যিক,
নাম করলেই যে-কেউ চিনতে পারবে।

আপনার বিরোধী শিবিরের লোকেরা
যা বলে তা আপনার জানা :
আপনি নাকি মালিকপক্ষের লোক,
আপিসে এসে যথাস্থানে কুর্নিশ না ক'রে
জায়গায় বসেন না ।
কেউ কেউ আরো যা-তা বলে আড়ালে,
আপনি নাকি বিদেশের চর,
এদেশের গোপন খবরের নিজস্ব সংবাদদাতা।
কিন্তু হিংসুটে আর পরশ্রীকাতরদের এসব ব্যাখ্যায়
আপনার কী এসে যায় ?

মনে পড়ে প্রায় বছর পনেরো আগে
আপনার পদোন্নতি হয়নি বলে
আপনি চাকুরি ছেড়ে দেবার হুমকী দিয়েছিলেন
অবশ্য মালিকপক্ষকে নয়
আমাকেই, রেঁস্তোরায় চা খেতে খেতে।
এখন আর সেদিন নেই
আপনার এখন দারুণ বাড়-বাড়ন্ত,
বন্ধুরা তো ঈর্ষা করবেই।

রেডিয়োতে আপনার গলা, টিভিতে ওই চেহারা,
এতো প্রায় রোজকার ব্যাপার,
আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার প্রতিটি প্রচেষ্টা
আপনার কী সুন্দর উৎরেছে !
এখন আর আপনার অভিষ্ট বলে কিছু নেই,
যেমন অনেকের থাকে—
দেশসেবা কি অনুরূপ অন্য কিছু,
যা অনায়াসে মানিয়ে যেতে পারে।

অবাক লাগছে এই ভেবে যে আপনি
আমাকে নাম ধরে ডাকলেন,
চিনতে পারলেন ;
ইচ্ছে করলেই তো মুখ ফিরিয়ে
চলে যেতে পারতেন।

গেলেন না কেন তাই ভাবছি।
শুনেছি আপনার প্রতি কর্তৃপক্ষ এখন
তেমন প্রসন্ন নন,
আপনি নাকি অন্য কোনো পত্রিকায় যাবেন
এমন গুজব রটেছে ;
পড়ন্ত বয়সে নতুন উদ্যোগ নেয়া
সোজা ব্যাপার নয়।
শুধু কি সেই কারণেই লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন,
যাকে সঙ্গে রাখা যায় ?

চা খেতে-খেতে

আসুন না একসঙ্গে বসি,
চা খাই ;
আগেকার মতো কিছুক্ষণ
আসর জমাই ।

কতোকাল বলুন তো দেখা-সাক্ষাতের
সুযোগ পাই নি ?
এক-কুড়ি বছরের বেশী হতে পারে,
পায়ের তলায় মাটি
আছে কিংবা নেই ভেবে ভেবে
যখন উদ্বিগ্ন প্রাণ,
কখন আড়াল দিয়ে হাজার পাখির মতো
উড়ে গেছে কুয়াশার দিকে
চতুর সময় ।

আসুন-না চা খাই
আসর জমাই :
তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা থাকে কাছাকাছি,
আনি সবাইকে ডেকে ।

বয়সের নানা ছাপ এখন শরীরে
এ তো স্বাভাবিক ;
চুল পাকে দাঁত পড়ে চোখে ছানি,
বেঁচে থাকতে হ'লে দীর্ঘকাল
এসব তো স্বাভাবিক, কিন্তু মনটাকে
কে বাঁধবে বলুন । শাড়ীর পাড়ের মতো
সমস্ত জমিন ছিঁড়ে গেলে
তবু থেকে যায় তার কিছু রঙ,
মন কিন্তু সহজে মরে না ।

আসুন-না রেস্তোরাঁয়, চা খাই
আসর জমাই
ঠিক সেই আগেকার মতো! বন্ধুরা সবাই
কে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল
কে ডুবেছে কে ভেসেছে সংসারের সমুদ্রে ঢেউ-এ
ইচ্ছা হলে যেত জানা
এসব খবর?
তবু ঘুরে ফিরে
এই যে ক'জন বন্ধু এসে গেছি
খুব কাছাকাছি
এও তো সুযোগ, বলতে গেলে বিধাতার
অসীম করুণা।
নইলে আয়ুর সূর্য যে-সময়ে হেলে আছে
দিগন্ত-পশ্চিমে
সে-সময়ে কে ভেবেছে বন্ধুদের
দেখা-সাক্ষাতের এমন সুযোগ
ফের পাওয়া যাবে?

বাঃ! আপনি বলছেন না একটি কথাও
এতো চুপচাপ হলে একালে কি চলে!
এতো যে বকছি কিন্তু আপনি জানেন
আমার স্ত্রী-পুত্র-মেয়ে কেউ বেঁচে নেই;
চা-বিস্কুট খেতে খেতে সারা দিনরাত
আড্ডা দিতে পারি আমি এখন অক্লেশে।

ভয়

সমস্ত সময় আমি অভিভূত থাকি।
কে ওখানে, অন্তরালে কে আছো ওখানে?
সিগারেট পুড়ে যায়, ইলেকট্রিক বাতি নিরন্তর
সজ্জিত নিয়নে পোড়ে, নন্দিত নগরে
শব্দের ঝড়ের বেগ, রক্তবত আত্মদানে
প্রতিশ্রুত দিনগুলো আয়ুশ্রান্ত বিষণ্ণ জোয়ার।

কে ওখানে আছো আমি জানিনা কখনো।
কেবল বিন্যস্ত কাজে ঢের স্নিগ্ধতায়
আমলকী ছায়াবনে পুকুরের শৈবাল দর্পণে
কেউ যেন নিয়ে যেতে চায়।
ভীষণ সন্ত্রাসভরা পৃথিবীর দুইটি শিবিরে
যদিও উজ্জ্বল রৌদ্র, ছায়াময় কালো ভয়গুলি
অলক্ষ্যে নিহিত পাশাপাশি।
ঘর যদি ভেঙে পড়ে তবে হেঁট মুখে
ঝড়ের পাখীর মতো ডানা ভেঙে প'ড়ে
কার কাছে যাব?

বৃদ্ধ শিশু যুবতী যুবক কিংবা তরুণী তরুণ
ফিরে ফিরে আসে কোনো শূন্যগর্ভ আকাঙ্ক্ষার তীরে
রিক্তপায়ে আশ্রয় সন্ধানে।
কে ওখানে, অন্তরালে কে আছো ওখানে?
তুমিই কি সেই ব্যাধি যার নাম ভয়?

সমস্ত সময় আমি অভিভূত থাকি।

দরজার কাছে

দরজার কাছে পাখা ঝাপটায় প্রবল হাওয়া।
আকাশ ক্রমশঃ অন্ধকার, নীল শূন্যের মধ্য দিয়ে
চক্রবালের দিকে পাখিগুলো
মিলিয়ে গেল।
কয়েকটা ঝরাপাতা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়,
বাগান থেকে লাফিয়ে এসে বেড়ালটা
দ্রুত পায়ে বারান্দা পেরিয়ে গেল।

আজ কি বার? কোন তিথি?
এখন দরজার কাছে দামাল হাওয়ার
প্রবল ঝাপটা কেন?
রাত বাড়তে বাড়তে ক্রমে মধ্যরাত্রি,
হাওয়ার ভিতরে এখনো তালবেতালের যুদ্ধ;
একটা গাছের ডাল কোথায় যেন হুড়মুড় ক'রে
ভেঙে পড়লো;
ককিয়ে উঠলো পথের কুকুর,
আমি ঘুমোবো, দেখি ঘুম আসে কিনা।

সংযোজন

বাগান

কতোকাল যাই নি বাগানে।
এখন সেখানে কোনো দৃশ্য রমণীয়
দেখা যায় কি না
বলতে পারি না। দৃশ্য সম্মোহনে
সুখ আছে কি না
বলতে পারি না। টগর গোলাপ
বকুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া
নামগুলো পরিচিত খুব
শৈশবে কৈশোরে।
বাগানে ফুলের সমাবেশে
ফুল কুড়াবার স্মৃতি
এখনও মনে। অথচ এখন

নিতান্ত কিশোর যারা হয়তো বাগানে
ফুল ফোটে কি না
তাকিয়ে দ্যাখে না। ফুলের আহ্বান
হয়তো ধূসর স্মৃতি ; চার দিকে
ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে
সর্পিল আগাছা অন্তহীন
ফণা তুলে আছে।
এখন বাগান নেই বৃক্ষ নেই
পথে পথে শিশু
ধূসর কঙ্কাল। অথবা কিশোর
ভীষণ ক্ষুধার্ত এক রক্ত-পৃথিবীর
নির্মম শরিক ;
পথে পথে অসংখ্য শহীদ
নামহীন কিন্তু ভালোবাসাময়
উন্মুখ প্রেরণা। এখন প্রেমিক কেউ

ফুল নিয়ে বসবে কি ফের! ফুলের মালায়
বিবাহ-বাসর সাজালেও
কিংবা জন্মদিন পালনের
সংকল্পে অটল যদি বা,
সমস্ত ফুলের চিহ্ন গোপনে আড়ালে
ফোঁটা ফোঁটা রক্তে পরিশ্রুত।
আবার বাগানে ফুল ফোটাবার পিপাসায়
দ্রুত-পলায়নপর দিন
ঝরায় বিষণ্ণ কণিকাকে
হৃদয় অতলে।

বাগানে এখন কোনো দৃশ্য রমণীয়
দেখা যাবে কি না
বলতে পারি না।

ভোর

কাক ডাকে। ভোর হয়। সবাই যে যার ঘর থেকে
বের হয় নতুন যাত্রায়। রাতের দুঃস্বপ্নগুলি সব
বুকের কোথাও আছে এখন ঘুমিয়ে। চারদিকে
প্রথম ভোরের চিহ্ন, চোখ থেকে ক্রমে শেষ ঘুম
মুছে যায়, তরুণ নরম সূর্য নীলিমার মুখ
লাল করে প্রথম চুমোয়। নীচে সারিবদ্ধ গাছে
পাখিগুলি সায় দেয়, উড়ে যায় বনের ভিতরে।
মানুষের ঘুম ভাঙে, বেদনার ঘুম ভেঙে দ্যাখে
ফুটপাথে শুয়ে থাকা অন্ধ শিশু মায়ের শরীরে
লেপ্টে থাকে, ছোট হাত দিয়ে ধরে শুষ্ক স্তন।
তাকে ঠেলে দিয়ে উঠে জেগে বসে বিশীর্ণ রমণী,
হঠাৎ শাপান্ত করে পৃথিবীকে অশ্রাব্য ভাষায়।

শেষের সীমায়

কেন তুমি সারাক্ষণ এখনো পেছনে
অদৃশ্য রজ্জ্বুতে বার বার
আমাকেই টেনে টেনে রাখ !
যদি বাঁচতে চাও ওই পথের আড়ালে
চলে যেতে পার। একা আমাকেই
আত্মহননের এই মন্ত্র নিতে দাও।

জ্বলতে জ্বলতে এইবার
শেষের সীমায়
পৌঁচেছি হয়তো। দারুণ দুঃস্বপ্নগুলো
কতোকাল নাচে আশেপাশে ;
পদতলে বারবার শায়িত কঙ্কাল
ঝরা আকাঙ্ক্ষার।
আমার জন্যেই এই দারুণ নিমেষ
অপেক্ষায় ছিল। চতুর্দিকে
ফুলহীন গাছ ; পাখিরা উধাও, ডালাপালা
বজ্রাহত, কীটদষ্ট সমস্ত শিকড়।
আমার পশ্চাতে তুমি ছায়া-সহচর
বিরল চেতনা। তুমি এখনও
উজ্জীবন মন্ত্র দিতে চাও
শ্রুতিলুপ্ত কানে : অথচ আমি সে

জ্বলতে জ্বলতে পৌঁচে গেছি শেষের সীমায় ,
পাথরে রক্তের দাগ, গোলাপ ধুলোয়
ছিন্নভিন্ন এবং ধূসর। তবু তুমি কেন
কেন যে পশ্চাতে থাক আর্দ্র বক্ষোলীন,
উজ্জীবন মন্ত্রে বার বার
আমাকে ভোলাও
যখন নিমেষ সব জ্বলন্ত অঙ্গার !

লোকটিকে দ্যাখো

ঐ যে লোকটি খাটে সারাক্ষণ সাজানো বাগানে
ঝাঁজরিতে জল দেয়, ধুলো ঝাড়ে, সজ্জিত শাখায়
কীটদস্ট পাতাগুলি ছেঁটে দিয়ে তার সন্নিধানে
নতুন চারার গুচ্ছ হাতে নিয়ে মাটিতে লাগায়
এবং গোলাপ কিংবা কৃষ্ণচূড়া, চন্দ্রমল্লিকার
উদ্ভাসিত হাসি দেখে সংসারের কপটতা ভুলে
মগ্ন থাকে কিছুক্ষণ তার চেয়ে স্নিগ্ধ সুখী লোক
আর তো দেখি না কিছুদিন। কর্তৃপক্ষ তার
আত্মম্ভরী, সংসারী, বিষয়ী। টাকা দিয়ে যোগ্যতার
যদি পরিমাপ হয় তাহলে এ লোকটির প্রভু
অবশ্যই অবাক মানুষ। সবচেয়ে মজা এই
বাগান করার সখ ষোল আনা। যদিও ফুলের
নিটোল সৌন্দর্য তার চোখে আনবে না কোনদিন
শিল্পীর জীবনবেদ। শুধুমাত্র মেয়ে বন্ধুদের
বাহবা কুড়াবে বলে লোকটাকে রেখেছে বাগানে
দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে।

ক্ষত অথচ শিল্পীত

অভ্যস্ত জীবন এই লোকটির ; নির্জন বাগানে
উদয়াস্ত রোজ খাটে ; শিরদাঁড়া বেঁকে যায় তবু
কুসুমিত শিল্পশালা তৈরী করে, বর্ণের আহ্বানে
গভীরে তলিয়ে যায় সম্মানিত প্রেমিকের মত
ফুলের লাবণ্যে চোখ অভিভূত হলে। প্রভু তার
শিশ্নোদরপরায়ণ, বন্ধুপত্নী, বান্ধবী কি বন্ধুভগ্নী যদি
সজ্জিত বাগানে ঘুরে পরিতৃপ্ত মুখে হাসি এনে
অন্তত একটিবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়
এবং তারিফ করে মালিকের কিছুটা অন্তত
তাহলেই প্রভু খুসী, ফুল নয় নারীর শরীর
যেহেতু আকাঙ্খা তার ; অতি মূর্খ মালীটা বরং
বাগানের সংরক্ষণে রাতদিন দুপুর জাগুক।

ঐ যে লোকটি খাটে, প্রভু নয়, ভৃত্যই হয়তো,
মমতা, সস্নেহ যত্ন ঢেলে ঢেলে প্রচ্ছন্ন মাটিতে
রসগর্ভ চেতনার ধারা আনে তার মতো আর
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তুমি দেখবে না এখানে কোথাও।
বৃষ্টিতে ক্ষরায় কিংবা গ্রীষ্মে শীতে দ্যাখো সর্বদাই
বিরল আকাঙ্ক্ষা তার বুকে আনে সুন্দর সৃষ্টির
জ্যোৎস্নাসিক্ত পূর্ণিমা নির্ঝর। বিস্মরণে থাকে তার
তিরিশ টাকায় কেনা বজ্রাহত দুর্বহ সংসার।

গোপাল মুখার্জি

গোপাল মুখার্জি, গোপাল মুখার্জি, আওড়াতে
লাগলাম মনে মনে
বাস চলছে দ্রুত, চতুর্দিকে ভিড়, ভয়ঙ্কর হুড়োহুড়ি,
শুধু মনে হল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু দূরেই
গোপাল মুখার্জি, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু,
উজ্জ্বল ফর্সা, সুন্দরতম পরিহাসরসিক
গোপাল মুখার্জির হাতখানা
ধাবমান বাসের ঝুলন্ত ভিড়ের হাতলে।

ভীষণ ব্যস্ততায় আমি ফুলের বাগানের দিকে যাচ্ছি,
আবার সেই কৈশোর এক মুহূর্তে চোখের সামনে,
তিরিশ বছরের দীর্ঘ সময় স্মৃতির বাগানে
ফুল হয়ে ফুটেছে চোখের সামনে,
যখন দেখলুম মুখার্জিকে বাসের ঝুলন্ত যাত্রায়।

তিরিশ বছর দেখিনি, কবেকার সেই ফুটবল-মাঠে
শেষ দেখা, দুজন দুদিকে কোথায় ভেসে ভেসে
স্মৃতি বুদ্বুদ হয়ে তলিয়ে গিয়েছিলাম।

বাসের হাতলে গোপাল মুখার্জির হাত,
এই হাত কতোবার ছুঁয়েছি কৈশোরে,
আজ যদি একবার ভিড় ঠেলে পৌঁছাতে পারি,
অবাক ক'রে দেবো মুখার্জিকে।
দারুণ ভিড়ে গাড়ীর দোলায় বারবার
মিলিয়ে যাচ্ছে মুখার্জি, এই নারকীয়তায়
আমাকে দেখলে চিনতে পারবে কি হঠাৎ?
যদি নেমে পড়ে আগেই কোথাও অগোচরে।
কী করে কাছে যাব, কী করে ফিরে পাব,
ভীষণ উর্ধ্বশ্বাস দারুণ রেশারেষির ভিড় ঠেলে।
না, মুখার্জি আমাকে দেখছে না,
মুখার্জি জানছে না তিরিশ বছর বাদে কেউ
আবার তাকে টেনে আনতে চাচ্ছে
অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায়।

চোখের সামনে আমার কৈশোর, মুখার্জির
উজ্জ্বল মুখ, খেলাধূলোর স্মৃতি;
এক নিমেষেই যেন অনেক আকাশ, নদী, ফুল, পাখি,
অনেক পবিত্র নিরাময় অনুভবময়তায়
প্রাণ হু হু-করা স্মৃতিচিত্রণের পটে
আকাশ-গঙ্গা লিপি।
দেখলুম মুখার্জি নামছে বাস থেকে,
ভিড়ের ঢেউ ভেঙে সমস্ত শক্তিতে
অজস্র লোকের কটূক্তি মাথায় নিয়ে
লাফিয়ে নামলুম রাস্তায়।

অনেক লোক নামছে, চারদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি,
কিন্তু কোথায় ভিড়ের ঢেউয়ে
বুদ্বুদের মতো তলিয়ে গেল সেই মুখ:
গোপাল মুখার্জি, নিশ্চয় গোপাল মুখার্জি,
আওড়াতে লাগলাম মনে মনে।

আসা যাচ্ছে না

এখন আর কাউকে বলি না : এসো ।
কেননা 'এসো' বললেই,
মাঝপথে স্টিয়ারিং বেঁকে যায়, পথের খোদলে
জল ছিটকে ওঠে,
একবার উঁচু একবার নিচু হ'তে হ'তে
একটা আর্তনাদ তুলে গাড়ি থেমে যায় ।
একবার 'এসো' বললেই যাদুমন্ত্রের মতো
জমতে থাকে আকাশে কালো কালো মেঘ,
ঝড়ের হাওয়ায় দীর্ঘ তালগাছ নুয়ে পড়ে ;
লাইনের ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের ঘঘর শব্দ
বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় ।
'এসো' বললেই পৃথিবীর সব আদিম অন্ধকার
সাপের মতো মাথা নাড়তে থাকে,
ছড়িয়ে পড়ে এক নিমেষে সারা শহরে,
জলের মধ্যে ম্যানহোলগুলো মুখ উঁচু ক'রে থাকে :
একতলা তিনতলা সতেরো তলার বাড়ির মাথার ওপর
কালো কালো বিশাল শকুনের মতো মেঘগুলো
ভিড় করে,
জলের অবিরল ধারার মধ্যে ভিজে শহর
যেন অভূতপূর্ব দৃশ্যের নায়ক,
গির্জার ঘড়িতে রাতের ঘণ্টা বাজতেই চমকে ওঠে ।
এখন 'এসো' বললেই আসতে পারা যাচ্ছে না,
শালবনের ওপর দিয়ে কাশবনের ভেতর দিয়ে
ঢেউয়ের মতো বয়ে চলেছে বৃষ্টি ;
সমস্ত বঙ্গোপসাগর খ্যাপাটে মোষের মতো ক্রুদ্ধ,
এক একটা ঝাপটা আসছে দূর থেকে
আর অন্ধ হয়ে আসছে শহরের চোখ ।
'এসো' বললেই আর আসা যাচ্ছে না ।

ঘরের চাবি

একটি ঘরের চাবি হাতে নিয়ে ঘুরছি সর্বদা।
অথচ কোথাও সেই প্রাসাদের অবরুদ্ধ দ্বার
দেখছি না যেখানে পৌঁছেই অনায়াসে
কবন্ধ ছায়াকে আমি ঠেলে ফেলে দিয়ে ফের
খুলব উজ্জ্বল দ্বার যে-কোনো নিমেষে।
একটি ঘরের চাবি হাতে নিয়ে ভাল করে দেখি.
রাজপ্রাসাদের দ্বার খুলব বলেই এত কাল
এই চাবি নিয়ে আমি সন্তপর্ণে গোপনে ঘুরেছি,
জনারণ্যে জনপদে যে সময়ে দস্তুর চীৎকার।

একটি কবন্ধ ছায়া কেবলি আমার চারদিকে,
মনে হয় বাজপাখি তীব্র তার উজ্জ্বল নখরে
পায়রার বুক ছিঁড়ে একতাল মাংস নেবে বলে
সর্বদা প্রস্তুত থাকে পত্রশূন্য বৃক্ষের আড়ালে।
একটি পুরানো তালা কোথাও আবদ্ধ জর্জর,
খুললেই উন্মোচিত হতে পারে আলোক-সরণি,
ঝড়ের ঘূর্ণিতকেন্দ্রে চমৎকার রক্তঝরা স্বর,
কখনো রৌদ্রের দিনে ওড়ে ক'টি মুগ্ধ প্রজাপতি।
চাবিটা হাতেই আছে কিন্তু সেই অলৌকিক তালা
পেলে তবে স্নিগ্ধ হবে ক্ষয়কারী দিনের চেহারা।

অন্য পৃথিবী

গ্রীষ্মের রোদ্দুরে ঘর থেকে বেরুতে চাও না।
বর্ষার দিনে কর্দমাক্ত রাস্তা,
জলে থৈ থৈ ম্যানহোল,
মাঝপথে থেমে-থাকা ট্রাম…
এমন দিনে ঘর থেকে টেনে বার করে সাধ্য কার!

উত্তর থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এলেই
গলা খুসখুস, নাকে সর্দি ;
চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরের বিছানায়
সারাক্ষণ লেপ্টে থাকা,
জানলা দরজা সব বন্ধ আছে জানতে পারলেই নিশ্চি

অথচ একবার ঘর থেকে পথে নামলেই
রোদ্দুর তেমন দুঃসহ নয়,
বৃষ্টিতে ভিজেও মন দরাজ,
শীতের হাওয়ায় জোরে পা ফেলে চলতে চলতে
কতো সহজেই না এগিয়ে যাওয়া যায় ;

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেই
অন্য পৃথিবী।

ভয়

ভয়ের রাজ্যে বাস করতে করতে এক সময়
দূরের দৃশ্যগুলো ঝাপসা হয়ে আসে,
একাকার হয়ে যায় দিন আর রাত,
মনে হ'তে থাকে
আদিগন্ত কুয়াশার ভিতরে কোথাও দুলছে
কাল-কেউটের ফণা,
সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে।
ভয়ের রাজ্যে বাস করতে করতে এক সময়
কী আশ্চর্য,
অন্ধকারেই সব ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে,
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
নিজেদের মুখগুলো চেনা হয়ে গেলে
কুয়াশার ভিতরেই একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া যায়

ছবি

সব ছবি যদি ভাঙা হয়
তাহ'লে কি চলে।
কাঁচের আধারে ছবিগুলি
দেয়ালে টাঙানো থাকে ;
ক্রমে ধূলিধূসরিত, ফ্রেম ভেঙে গেলে
ক্রমশবিবর্ণ হয়ে একদিন
লুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সব ছবি
বিলুপ্ত হবার নয় ; বুকের ভিতরে
অমাবস্যা পূর্ণিমায় সংগ্রামী নিমেষে
ছবি থেকে অন্য ছবি,
নিয়ত ছবির জন্ম হয়।

শারদীয়া দিনগুলি

শারদীয়া দিনগুলি মনে করিয়ে দেয়
এখন আকাশ মেঘমুক্ত,
নীলিমা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে গলানো রোদ।

শারদীয়া দিনগুলি মনে করিয়ে দেয়
এখন মাটি ছেনে মূর্তি গড়ার দিন,
মণ্ডপের দোচালার আশেপাশে
শিশুদের ভিড় করবার সময়।

শারদীয়া দিনগুলি মনে করিয়ে দেয়
এমন দিনে যিনি কবিতা লিখতেন,
সারাক্ষণ থাকতো কাগজ আর কলমের ব্যস্ততা,

জমে উঠতো
নিঃশেষিত চায়ের কাঁপে চারমিনারের টুকরোগুলি,
তিনি আজ নেই।

ফিরে আসতে হয়

মাঝে-মাঝে ফিরে আসতে হয়
নিজের উৎসের কাছে। কেননা জীবন
নদীর জলের মতো সতত প্রবহমান হলেও কখনো
তেমন সহজ নয় অথবা নির্মল।

কেননা জীবন আজ ফেরারী, প্রবাসী, প্রতিদিন
তার কাছে আততায়ী হিংসুক সময়

ছিনতাই ক'রে নিতে চায় যতো মূল্যবান
স্বর্ণ স্বপ্নগুলি। কেননা জীবন
পর্বে পর্বে সঞ্চারিত পূর্ব থেকে ভাগকরা দৃশ্য নয়,
কিংবা নার্সারী থেকে কিনে আনা ফুলে
তৈরী করা মালা।
জীবন এখন শুধু বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায়
নিরন্তর গতিবেগে আশ্চর্য প্রস্তুতি,
তীব্র অন্তর্জ্বালা।

মাঝে মাঝে ফিরে আসতে হয় তাই
নিজের উৎসের দিকে, জেনে নিতে হয় নিজেকেই
আবার নতুন ক'রে ঘর বাঁধবার
প্রতিশ্রুতি দিতে।

বড়ো নরম ভাবে

বড়ো নরম ভাবে শুরু হয়েছিল এক সময়,
বড়ো আলতোভাবে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
তোমার চিবুক ঠোঁট আর দু'টি চোখ…

ফুল ফুটতে থাকলে কি কোনো শব্দ হয় ?
ফুল ঝরে যেতে যেতে কি কোনো
কথা বলে' যায় ?
নদীর নির্জনে এসে দু'দণ্ড দাঁড়ায় সমুদ্র হাওয়া—
নিস্তরঙ্গ জলে মুখ দেখতে দেখতে তার মনে কী হয় ?

তার মনে আজ কী হয় ?

বড়ো নরমভাবে শুরু হয়েছিল এক সময়,
এখন ভাবতে অবাক লাগে
এই ঠোঁট ফুলের পাপড়ির মতো স্ফুরিত ছিল,
শিল্পীর তুলির টানে যেন বিন্যস্ত ছিল
ওই চিবুক,
দু'চোখে ঢলঢল লাবণ্য।

বড়ো নরম ভাবে শুরু হয়েছিল এক সময়,
নৌকো ভেসে চলেছে সময়ের স্রোতে,
ক্রমশ সরে যাচ্ছে দৃষ্টি পথের বাইরে,
আর ফিরে আসবে না।

ঘুমের জগতের দিকে

রাত গভীরতর হলে কেউ ঘুমের জগতের দিকে
ঠেলতে থাকে আমাকে।
রাত থেকে গভীরতর রাত, ঘুম থেকে গভীরতম ঘুম,

যেন কোথাও হারানো রাজপ্রাসাদের আভাস :
খিলান অলিন্দ সিঁড়ির বিশালতায়
নতুন এক দ্বিতীয় উন্মোচন।

আমি নিজেকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখব বলে
ঘুমের ভেতরে যুদ্ধ করতে থাকি ;
পুরনো দৃশ্যের খোসা ছাড়িয়ে
দেখবার চেষ্টা করি
বহমান বস্তুজগৎকে, যেখানে

আমার শরীর আমার হাতের মুঠি আর পায়ের গোড়ালী
বিপরীত স্রোতে না ভেসে গিয়ে
রোদে ঝড়ে পথ ক'রে নিতে চায়।

ভয় করে যখন ভাবি কেউ আমাকে অন্তরাল থেকে
অনবরতই ঠেলে দিচ্ছে
ঘুমের জগতের দিকে।

অসময়

আমাদের সময়টা ছিল অন্য রকম, সুশৃঙ্খল
পোষা পায়রাগুলোকে ছেড়ে দিলে এক সময়
তারা চলে যেত শূন্যে, নীলাভ আকাশে ;
আশ্বাসে ভর ক'রে ফের নেমে আসত।
ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ঠাকুর দেবতার ছবি
দেয়ালে টাঙানো।
ধার ক'রে নিতে হয়েছিল পিতাপিতামহদের কাছ থেকে
নীতিকথার সূত্রগুলি
ভালো ভালো ভাষণ থেকে জেনে নিতে হয়েছিল
কোনটি জীবনের ধ্রুবতারা

আমরা সজীব বিশ্বাসে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিলাম
স্বর্ণযুগের ছবি।

অথচ, পুত্র, তোমার সময়ে একি কালো হাওয়া বইছে,
সময় যেন বাঘের মতো নখে ছিঁড়ে নিতে চায়
বুকের পাঁজড় আর চোখের স্বপ্ন,
পুরনো আমলের কাহিনী এখন তোমার কাছে
নিছক ঝাপসা কতকগুলো ছবি
কিংবা প্রাচীন মন্দিরে দেয়ালে খোদিত
ভাঙা পাথরের ভাস্কর্য।

তুমি ঘর গুছিয়ে উঠতে পারছ না,
চোখের সামনে দেখছি
ছড়িয়ে ছিটিয়ে জঞ্জাল হ'য়ে উঠছে সংসার,
তুমি শ্বাসরুদ্ধ প্রতি নিমেষে
বাঁচিয়ে রাখতে চাইছ সময়ের সিংহ থাবা থেকে
যা একান্তই নিজস্ব তোমার।

তোমার পিতামহ সস্নেহ যত্নে আমাকে রেখেছিলেন
তাঁর বুকের কাছে,
আমার বুক ভাঙা, এই অনিশ্চিত সময়ে
আমি তোমাকে কোথায় রাখব?

ধর্মঘটের দিনগুলি

মনে পড়ে
ধর্মঘটের সেই দিনগুলির কথা
যখন
বিশাল ঐক্যের এক পতাকাতলে
উচ্চারিত হয়েছিল শপথ।

শহরটাকে তখন মনে হয়েছিল
জামা কেড়ে নেয়া শরীরের মতো ;
অস্ত্রোপচারের টেবিলে শায়িত
রুগীর মতো নগ্ন ।

সেই দিনগুলিতে সবাই ছিল ক্ষুধার্ত,
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত ;
হাজার হাজার লোকের মিছিলে
স্বাধিকার রক্ষার ধ্বনিতে
কেঁপে কেঁপে উঠেছিল নষ্ট শহরের বুক ।

ধর্মঘটের সেই দিনগুলিতেই সবাই
পার্কে পার্কে এসে বসেছিল দল বেঁধে
সুন্দর সব পাথরে খোদাই মূর্তির পাদদেশে ।
যে শহর ছিল আলোয় আলোয় উজ্জ্বল,
বার-এ রেস্তোরায় উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লাস—
বিজ্ঞাপনের নিয়ন আলোয় চকচকে ঝলমলে,
হঠাৎ যেন বিপরীত এক ধ্বনির স্রোতের টানে
নিথর হয়েছিল সারা শহরের শরীর ।

সেই দিনগুলিতে আকাশকে মনে হয়েছিল
নক্ষত্রখচিত মুক্তি ;
রাত্রিকে মনে হয়েছিল মুক্তিকামী মানুষের বন্ধু,
নদীর জলস্রোতকে জীবনের অফুরন্ত প্রবাহের প্রতীক

সেই দিনগুলিতে আশ্রয় মেলেনি কোথাও,
শুধুই পথ পরিক্রমা এখান থেকে ওখানে ;
মহারাজদের উপাসনার ঘরগুলো কেঁপে উঠেছিল,
দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল সারারাত
সবচেয়ে জমে-যাওয়া ঠাণ্ডায় ।

তবু সেই ধর্মঘটের দিন, অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের দিনগুলি
কোনো সন্দেহ নেই
পীড়িত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

রাস্তা, মাঠ, নদী

খোলা মাঠের মধ্যে এলেই
মনে হয়
এখন বীজ বপনের কাল ;
এখন সতর্কভাবে শুরু করতে হবে।
নদীর দিকে তাকালেই
মনে হয়
দূর নির্জন বাঁকে কোথাও
শীতল জলের ধারা প্রবহমান ;
শুকনো খেতের প্রচণ্ড ক্ষতটাকে
এইবার ধুইয়ে দেবার সময়।

বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়ালেই
মনে হয়
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা
ওই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের কাছে
আমাদের পিতাপিতামহদের
অনেক কৃতজ্ঞতা জমানো আছে।
রাস্তা মাঠ নদীকে ভালোবেসে তাঁরা
এই পৃথিবীর আড়ালে চলে গিয়েছেন।

মাত্র কটি কৃতঘ্ন মানুষ

ভালোবাসা দিয়ে এই জগৎকে জয় করা যায়,
কাছে টেনে নেয়া যায় বিপথগামীকে—
এসব শেখাতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল যিশু একদিন।

ভালোবাসা দিয়ে ওই বনের পাখিকে ধীরে ধীরে
জয় করা যায় ;
জয় করা যায় ওই হিংস্র পশুকেও অনেক সময়।
পাখি কাছে আসে, পশু সাড়া দেয়,
ডানা নাড়ে পাখি, ঘাড় নত করে পশুরাজ,
কৃতজ্ঞতা নীরবে জানায়.

অথচ মানুষ আজ পরস্পর থেকে ক্রমশঃ
দূরে সরে যায়। সাজায় গোপন ব্যূহ,
নির্মম পরিখা।
আড়ালে জ্বালাতে চায় বিষবাষ্পে সংক্রান্তির শিখা!
বেশী নয় মাত্র কটি কৃতঘ্ন মানুষ
দুহাতে বলের মতো পৃথিবীকে পদতলে চেপে
শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায় ;
হিংসা ও বিদ্বেষে ওরা একচ্ছত্র অধিকার চায়!

এ রকম অস্থিরতা

এরকমভাবে সব স্থির করা যায় না।
এই যে তুমি ভাবছ উত্তরের দিকে যাবে
নাকি দক্ষিণে বা পুবে
অথবা ফিরে যাবে ঘরের দিকে—
মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অস্থিরতা ভালো নয়।

একটা কিছু তোমাকে আগে থেকেই স্থির
রাখতে হবে।
যেমন তুমি জানো মাটিতে চারাগাছ লাগালে
জল দিতে হয়,
হাওয়ায় রোদ্দুরে মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে
ভেজা জামা,
নদীতে জল আছে কি নেই জেনে নিয়েই
নৌকো ভাসানো।

এই যে তুমি এখন একরকম পরমুহূর্তে
অন্যরকম :
আজকের কাজের সঙ্গে কালকের কাজের
কোনো মিল নেই,
আজ বেশ চোখে দেখছো, কাল অন্ধ।

এরকম অস্থিরতা তুমি জেনো একদিন
তোমার স্বপ্নের নীলিমাকে
বিবর্ণ করে দিতে পারে।

এই স্বপ্ন

চারদিকের আবহাওয়ায় কে যেন
কেবলই আগুন ধরিয়ে দেয়।
নদী-নালা জলশূন্য, গাছগুলোর
শুকনো ডালাপালায়
হলুদের ছোপ ;
মাঠের বিবর্ণ ঘাসের ভিতরে
কোথাও স্নিগ্ধতা নেই।

কে এ-রকমভাবে সমস্ত চরাচরকে
স্বপ্নহীন করে তুলেছে !

অথচ তুমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে
অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিলে ;
এখনো তোমার চোখের ভিতরে
দুঃখজয়ের স্বপ্ন,
নদী পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে
বনের পথ ছাড়িয়ে
এগিয়ে যাবার স্বপ্ন ;
তোমার বুকের মধ্যে দুঃখজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে
আকাশের মতো বিশাল ক'রে তুলেছে
এই স্বপ্ন।

তুমি জানো চলতে চলতে টলতে টলতে
মাঝপথে, মাঝ-দরিয়ায়,
মরুভূর ঝড়ে
এই স্বপ্নই পেশী আর বুকের মধ্যে
জাগিয়ে তুলছে জীবন।

ফিরে আসবে কিনা

তোমার কাছে দু'দণ্ড বসলেই আমি যেন পুরনো জগতে ফিরে যাই।
তোমার সমস্ত কথাই আজ সেই অতীত জগৎকে ঘিরে
যখন
হাতীশালে হাতী ছিল ঘোড়াশালে ঘোড়া,
রাজা ছদ্মবেশে বেরুতেন নগরে
সাধারণ লোকের সুখদুঃখের খবর নিতে ;
রাজমহিষী অলঙ্কার খুলে দিতেন গা থেকে
জন্মদুঃখিনী ভিখারিণীকে।

তুমি আমাকে মনে করিয়ে দাও
এক সময়ে নদীর জল ছিল পুণ্যতোয়া নির্মল,
গাছের শিকড়ে রস, শাখায় পাতার বাহার ;
কাছে দূরে সমস্ত কর্ষিত ক্ষেতে
সবুজের সমারোহ, গ্রীষ্মে বর্ষায় নদীর ঘাটে
পণ্যবাহী নৌকোর আনাগোনা,
বারো মাসে তেরো পার্বণ, ঘরে ঘরে সুখী সংসার।

তুমি এসব মনে করিয়ে দিতে থাক আর জিজ্ঞেস করো
এইসব দিন কখনো ফিরে আসবে কিনা।

কথার পর কথা

কথার পর কথা অক্ষরের পর অক্ষর···
যেন অচিরেই গড়ে উঠবে বল্মীক স্তূপ,
সে-স্তূপের ভেতর তলিয়ে যাবে তুমি।

এমন কথা বলো যা ছাইয়ের ভেতর থেকে
জ্বলে উঠবে আগুনের ফুলকির মতো,
আস্তে আস্তে দিগন্তের দিকে যে ফুলকি
ছড়িয়ে পড়বে হাওয়ায় ;
অন্ধকারকে আলোকিত করবে।

অথবা এমন কথা বলো যা পাখির মতোই দিগন্তের
অন্ধকার থেকে এসে
আশ্রয় নেবে মানুষের বুকের মধ্যে,
অনেক দিন বাদে গানের কলি ভেসে উঠবে ভিতরের দিকে,
আলোকিত হবে তোমার পারিপার্শ্বিক, সমস্ত অস্তিত্ব।

কথার পর কথা অক্ষরের পর অক্ষর···
স্তূপের মধ্যে তুমি নিজেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ো না।

নতুন অধ্যায়

যদি কেউ বলে ঃ এসো···
কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব
সংশয়ের লতার মতো চোখের সামনে
দুলতে থাকে।
কেননা
আগে লক্ষ্যটাকে স্থির করতে হবে
উপলব্ধির দিগন্তে চোখ রেখে,
তারপর যাত্রা।

এক এক সময় এক একটা ঝড়ের ঝাপটা।

ধুলো ওড়ে, দুলে ওঠে বাঁশঝাড়,

ঘূর্ণী হাওয়ায় উড়ে যায় স্তূপীকৃত জঞ্জাল :

মেঘে মেঘে ঘসা লেগে বিদ্যুৎ-চমক,

কালো হয়ে আসা নীলিমায়

জটলা করছে বজ্র আর মেঘ,

তখন গন্তব্য স্থির রেখে এগিয়ে যাবে কে ?

রক্তে স্বেদে অঙ্গীকারে কারা জ্বালিয়ে রাখবে

বুকে-বুকে

অনির্বাণ অগ্নিশিখা ?

এতোকাল ধ্বনি শুনেই রোদ জল কাদায়

দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ

চমকে উঠেছে।

আজ যেন ধ্বনিটা বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে,

মরচে-পড়া পেরেকের মতো ক্ষয়ে গেছে তার ধার।

এসো বললেই এখন আর এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না;

তুলসী মঞ্চের ধারে

ভাঙা দরজার কোণায়

উঠোনে আর লাউয়ের মাচানে

এখন হাওয়ায় হিস হিস করে উঠছে জিজ্ঞাসা।

বুকের মধ্যে সেই অমল নক্সাটাকে খুঁজেপেতে

বার করতে হবে ;

যে-রকমভাবে খুঁজে পাওয়া যায় সমুদ্রতল থেকে

আসল মুক্তোকে,—

তখনই শুরু হবে সঠিক বাঁক নিয়ে নতুন অধ্যায়।

নতুন দিনের মুখে এসে

যা কিছু ঘটছে চতুর্দিকে
সব মেনে নিতে
বুকে বড়ো কষ্ট হয়,
সমস্ত চোয়ালে রক্তে অস্থিরতা বাড়ে।

এখন রক্তের নীচে
ভীষণ সন্দেহ দোলে,
অবিশ্বাস, দুঃসহ শূন্যতা ;
যেন বাগানে ঢুকেছে সাপ,
ফুলগুলো ঝরছে নিমেষে
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে। অথচ এখন ফের

পাশাপাশি চললেই দুঃস্বপ্নের শব,
সন্দেহের সর্পিল বিভ্রম
কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে
ক্ষিপ্র পায়ে ঢেউ তুলে
যাওয়া যায় অভিভূত টানে
যেখানে জলের মতো স্বচ্ছ দিন,
এবং রৌদ্রের সমারোহ
দিকে দিকে।

নষ্ট দিনগুলোকে আবার
ভুলে যেতে হবে। যে-রকম
দুঃস্বপ্ন ক্রমশ লীন
দিনের আলোয়। যে-রকম
দুষ্টক্ষত নিরাময় হ'লে
হেসে ওঠে সুন্দর মানুষ।

সূচীপত্র

স্বপ্ন-কামনা (প্রকাশ ১৯৩৮)

স্বর ও অন্যান্য কবিতা (প্রকাশ ১৯৫৩)

দিনযাপন (প্রকাশ ১৯৬৩)

এই এক সময় (প্রকাশ ১৯৭২)

বৃষ্টি এলে (প্রকাশ ১৯৭৩)

রুক্ষ দিনের কবিতা (প্রকাশ ১৯৮৩)

মানুষ জানে

অগ্রন্থিত কবিতা

সংযোজন